তাওহীদের ডাক

মে-জুন ২০১৩

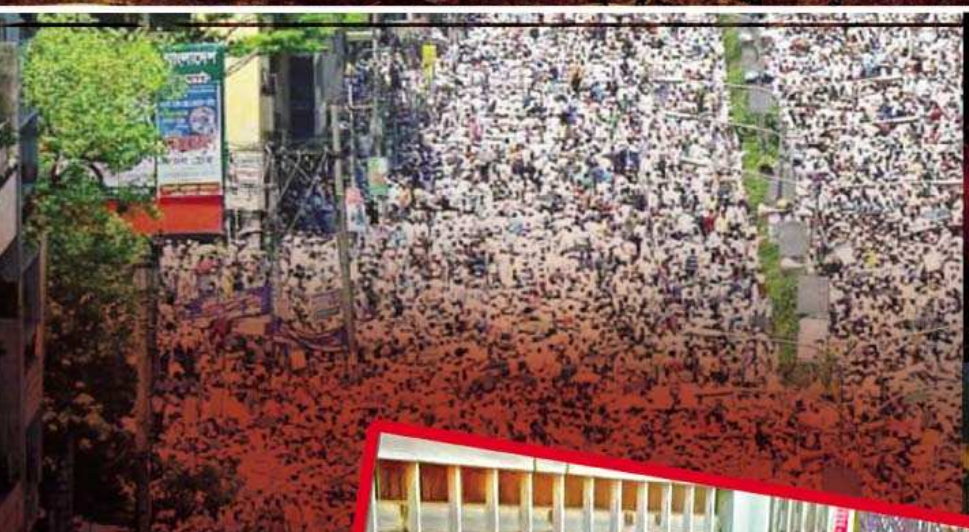

বাংলার আকাশে পরাধীনতার কালো মেঘ

- তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত
- রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা : জাহেলী যুগ ও বর্তমান যুগ
- তাক্বলীদ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য
- ইসলাম বিদ্বেষী ডাচ রাজনীতিবিদের অবশেষে ফেরা
- দালান ধ্বসের বিজ্ঞান

Contents

তাওহীদের ডাক

১২তম সংখ্যা
মে-জুন ২০১৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
সহকারী সম্পাদক
বযলুর রহমান

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৪৪৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **আক্বীদা** ৫
  তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত
  ড. আবু আমীনা বিলাল ফিলিপ্স
- **তাবলীগ** ৭
  রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা : জাহেলী যুগ ও বর্তমান যুগ
  ইমামুদ্দীন
- **তানযীম** ১২
  তাবলীগী ইজতেমা : একটি সংস্কারধর্মী গণআন্দোলন
  মুহাম্মাদ বযলুর রহমান
- **তারবিয়াত** ১৫
  শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার
  আযীযুর রহমান
- **তাজদীদে মিল্লাত** ২০
  তাক্বলীদ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য
  আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ২৫
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
  ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ২৮
  বাংলার আকাশে পরাধীনতার কালো মেঘ
  আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
- **ধর্ম ও সমাজ** ৩৫
  নেতৃত্বহীন জাতি : মুক্তির পথ কোথায়?
  আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম
- **পরশ পাথর** ৩৯
  ইসলাম বিদ্বেষী ডাচ রাজনীতিবিদের অবশেষে ফেরা
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **তারুণ্যের ভাবনা** ৪১
  দালান ধসের বিজ্ঞান
  শরীফ আবু হায়াত অপু
- **শিক্ষাঙ্গণ** ৪৩
  অমুসলিমদের জবানীতে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-২
  হাসীবুল ইসলাম
- **ভ্রমণ** ৪৬
  পাহাড়ের বুকে অন্য বাংলাদেশ
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫০
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫৪
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫
- **আইকিউ** ৫৬

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আল-হামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু ‘আলা মাল্লা নাবিইয়া বা‘দাহ

২০১৩ সালের শুরু থেকে বাংলাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এমন কিছু পরিবর্তনশীল ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে যা এদেশের ভবিষ্যৎ গন্তব্য সম্পর্কে দাঁড় করাচ্ছে এক জটিল সমীকরণ। মুক্তিযুদ্ধের ৪ দশক অতিবাহিত হবার পর বিতর্কিত ‘যুদ্ধাপরাধ’ ইস্যুটি সামনে এনে ক্ষমতাসীন সরকার যে নাটক শুরু করেছিল, তা এখন চূড়ান্ত পরিণতির পথে। ‘আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল’ নামক ‘বিচারালয়ে’ ইতিমধ্যেই একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের ঢালাওভাবে ‘অপরাধী’ ঘোষণা করে দণ্ডপ্রদান শুরু হয়েছে। একে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে দেশজুড়ে এক নযীরবিহীন রক্তক্ষয়ী সংঘাত। যাতে প্রাণ হারিয়েছে দুই’শরও বেশী রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে ‘যুদ্ধাপরাধ’-এর বিচারে কাংখিত ফাঁসির রায় না পাওয়াকে ছুঁতো বানিয়ে স্বার্থান্বেষী ‘মুক্তিযুদ্ধ’ ব্যবসায়ীরা এক নতুন খেলা শুরু করল। তাদের লেলিয়ে দেয়া একশ্রেণীর ‘ইন্টারনেটবিলাসী’ ভ্রষ্ট তরুণ রাজধানীর শাহবাগে ‘যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই’ ব্যানার সামনে রেখে শুরু করল এ দেশের হাযার বছরের ধর্মীয় চেতনার বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর অপতৎপরতা। পত্র-পত্রিকায়, ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদেরকে নিয়ে শুরু হল অস্বাভাবিক মাতামাতি। স্বার্থান্বেষীদের এই অতি উৎসাহের পিছনে যত না উদ্দেশ্য ছিল ‘যুদ্ধাপরাধের বিচার’, তার চেয়ে বেশী ছিল এ দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার এক নোংরা অভিলাষ। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে মিসরের তাহরীর স্কয়ারের স্থানিক আবেদনকে ব্যবহার করে তারা শাহবাগকে ‘প্রজন্ম চত্বর’ হিসাবে ঘোষণা দেয় এবং তাদের লালিত ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক্যবাদী চেতনাকে এ দেশের তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তার করার জন্য দেশব্যাপী ‘ঢোল-তবলা’র আন্দোলন শুরু করে। তাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ কুফরী চেতনাকে এ দেশের আপামর জনগণ বিশেষ করে ‘তরুণ প্রজন্মে’র চেতনা হিসাবে উপস্থাপন করা এবং সুকৌশলে ধর্মবিরোধী চেতনার একটি শক্ত সামাজিক ভিত দাঁড় করানো। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যখন এই নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনকে ‘দ্বিতীয় প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ’ আখ্যায়িত করলেন, তখন তাদের স্পর্ধা বৃদ্ধি পেল আরো বহুগুণ। কিন্তু স্বভাবতই শাহবাগ চত্বরের দূরদৃষ্টিহীন তরুণদের মুখে অব্যাহতভাবে ‘ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই’ শ্লোগান আর তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা কোন বিবেকবান মানুষ মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। সেই সাথে শাহবাগীদের কর্মসূচী কাগজে-কলমে একটি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলকে লক্ষ্য করে শুরু হলেও প্রচ্ছন্নভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের নিদারুণ বিতৃষ্ণার বহিঃপ্রকাশ এবং আন্দোলনের নামে উন্মুক্ত, উদ্দাম নৃত্য ও গান-বাজনাসহ তাদের চরম বেলেল্লাপনা ভিতরে ভিতরে চরম ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে। অতঃপর নিকৃষ্টতম নাস্তিক রাজীবের নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন এ আন্দোলনের নাস্তিক্যবাদী চরিত্র একেবারে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পেয়ে গেল, তখন দেশের আপামর জনতা আর স্থির থাকতে পারে নি। এমতবস্থায় শাহবাগীদের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলাম ১৩ দফা দাবী নিয়ে রাজপথে নামলে দল-মত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এ আন্দোলনকে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানালো। যার ঐতিহাসিক বহিঃপ্রকাশ ঘটল রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র শাপলা চত্বরে স্মরণকালের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ গণজমায়েতের মাধ্যমে। এই গণজমায়েত দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের বুকে যেমন নতুন এক সাহস ও উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করল, তেমনি একেবারে ম্রিয়মান করে ফেলল প্রায় দু’মাসব্যাপী শাহবাগী এবং তাদের দোসর ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবি ও মিডিয়ার উল্লম্ফ নাচন। সবচেয়ে বড় কথা রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননাকারী ও নাস্তিক্যবাদীদের বিরুদ্ধে যেভাবে গর্জে উঠল সর্বস্তরের মুসলমান এবং সমাবেশকে কেন্দ্র করে ইসলামের প্রতি যে সার্বজনীন ও প্রাণবন্ত আবেগ-উচ্ছাসের জোয়ার পরিলক্ষিত হল, তা ছিল এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এক মাইলফলক। ইসলামপন্থী এবং ইসলামবিরোধীদের মধ্যে পার্থক্যরেখাটা এত স্পষ্ট হতে দেখা যায়নি ইতিপূর্বে কখনও। ফলে কোন কোন ধর্মনিরপেক্ষ কলামিস্ট পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে যে, গত একশ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেনি *(আলী রিয়াজ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, প্রথম আলো, ৩০.০৫.১৩)*। এমনকি মিডিয়ায় এবং টকশোতেও হেফাজতের ১৩ দফা দাবী যেরূপ গুরুত্বের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ল তা ইসলামের আদর্শিক বিজয়ের দিকেই ইঙ্গিত করছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ৫ মে দিবাগত রাতের হতাশাব্যঞ্জক ও হৃদয়বিদারক রক্তাক্ত ট্রাজেডীর মাধ্যমে এ সম্ভাবনাময় আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় হঠাৎ ছেদ পড়ে গেল। তবে নেতিবাচক দিকগুলি বাদ দিলে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয়, এ আন্দোলন ইসলামের পক্ষে বহু অচেতন মুসলমানের ঘুমন্ত আবেগকে জাগিয়ে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে ইসলামের আদর্শিক বিজয়ের পথে একটা বড় সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। তাই সাময়িকভাবে হোঁচট খেলেও আগামীতে এ আন্দোলনের একটি সুসূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হবে, এটা নিশ্চিতভাবে আশা করা যায়। তবে এখান থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ও আদর্শে অবিচল একদল কর্মীবাহিনী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব না থাকলে কেবলমাত্র সাময়িক আবেগ দিয়ে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয় না। অপরদিকে আদর্শবান জান্নাতী মানুষ তৈরী না হলে আবেগী জনতা যত বেশী সংখ্যায় একতাবদ্ধ হৌক না কেন, তাতে ইসলামের বিজয় সাধিত হতে পারে না। সুতরাং বুলেট, ব্যালট কিংবা জনসংখ্যা কোনটাই ইসলামের বিজয়ের নিয়ামক নয়, বরং নিয়ামক হল ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল। এই বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের উপর মুসলমানরা যতদিন সুদৃঢ়ভাবে একতাবদ্ধ হতে না পারবে, যতদিন বাতিল আক্বীদা ও মতাদর্শের খপ্পর থেকে নিজেদেরকে বের করে নিয়ে আসতে না পারবে, ততদিন ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় প্রত্যাশা করা অমূলক। আল্লাহ আমাদেরকে এই চূড়ান্ত সত্যটি অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন এবং ইসলামবিদ্বেষী যাবতীয় অপতৎপরতার বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তোলার সামর্থ্য দান করুন। আমীন!

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন

আল-কুরআনুল কারীম :

১– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبادِ

'আর কোন কোন লোক এরূপ আছে যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মবিক্রয় করে। আর আল্লাহ হচ্ছেন তার বান্দাদের উপর স্নেহপরায়ণ' *(বাক্বারাহ ২০৭)*।

২- لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً–

'তাদের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। তবে যে ব্যক্তি দান করে অথবা কোন সৎকাজ করে কিংবা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করে। আর যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এরূপ করবে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব' *(নিসা ১১৪)*।

৩– يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ–

'তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র শপথ করে থাকে, যেন তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হচ্ছেন সন্তুষ্টি পাওয়ার অধিক হক্বদার যদি তারা সত্যিকারের মুমিন হয়' *(তওবা ৬২)*।

٤– لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ–

'এ (সম্পদ) অভাবগ্রস্থ মুহাজিরদের জন্যে যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হ'তে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (ছাঃ)-কে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যবাদী' *(হাশর ৮)*।

٥– يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ–

'হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহন করো না। তোমরা কি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছো, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখান করেছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়নের কারণে তারা রাসূল (ছাঃ) ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। আর যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক, তবে তোমরা তাদেরকে কেন বন্ধুরূপে গ্রহণ করছো?

তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর সে বিষয়ে আমি সম্যক অবগত। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এটা করবে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে' *(মুমতাহিনাহ ১)*।

٦– وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيهَا وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ–

'আল্লাহ মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়। এটাই মহা সফলতা' *(আলে-ইমরান ১৫)*।

٧– أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ–

'যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে, সেকি তার মত হতে পারে যে আল্লাহ্‌র আক্রোশে পতিত হয়েছে? বরং তার আবাসস্থল হ'ল জাহান্নাম। যা কতই না নিকৃষ্টতর আবাসস্থল' *(আলে-ইমরান ১৬২)*।

٨– قالَ اللَّهُ هَذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ–

'আল্লাহ বলবেন, এটা সেদিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা কাজে আসবে। আর তাদের জন্য থাকবে জান্নাত, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর এটিই হচ্ছে মহা সফলতা' *(মায়েদা ১১৯)*।

٩– لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً–

'মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহন করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি হলেন। আর তাদের অন্তরে যা কিছু ছিল সে বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রতি তিনি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়' *(ফাতাহ ১৮)*।

١٠– وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى–

'আকাশসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে! তাদের কোন সুফারিশ কাজে আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে তাকে অনুমতি না দেন' *(নাজম ২৬)*।

হাদীছে নববী থেকে :

١١– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا–

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দা যখন কোন কিছু আহারের পর এবং কোন কিছু পান করার পর আল্লাহ্‌র প্রশংসামূলক 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, তখন আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান' *(ছহীহ মুসলিম হা/৭১০৮; মিশকাত হা/৪২০০)*।

١٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللَّه جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। পছন্দনীয় বিষয়গুলো হ'ল, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করবে না এবং আল্লাহ্র রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর ছিন্নভিন্ন হবে না। আর অপছন্দনীয় তিনটি বিষয়গুলো হ'ল, মূল্যহীন অধিক কথাবার্তা বলা, অধিকহারে প্রশ্ন করা এবং সম্পদ বিনষ্ট করা' *(ছহীহ মুসলিম হা/৪৫৭৮)*।

١٣- عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّة يَا أَهْلَ الْجَنَّة فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْط أَحَدًا مِنْ خَلْقكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ জান্নাতের অধিবাসীদের লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীরা! তারা উত্তর দিয়ে বলবে, আমরা উপস্থিত হে আমাদের রব! তোমার কাছেই কল্যাণের চাবিকাঠি। অতঃপর তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, কেন সন্তুষ্ট হব না হে আমাদের রব! আমাদেরকে এমন পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, যা আপনার সৃষ্টির আর কাউকে দেননি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম পুরস্কার দিব না? জান্নাতবাসীরা বলবে, হে প্রভু, এর চেয়ে উত্তম পুরস্কার কি হতে পারে? আল্লাহ বলবেন, সেটা হল আমার সন্তুষ্টি তোমাদের জন্য অবধারিত হয়েছে। সুতরাং এরপর থেকে আমি আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬২৬)*।

١٤- عَنْ عَائشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللَّه بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّه وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ মানুষের দায়িত্ব নির্বাহে তার সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লার অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের উপরই সোপর্দ করে দেবেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৩০, হাদীছ ছহীহ)*।

١٥- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَة مِنْ رِضْوَانِ اللَّه مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ...

রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ কেউ (কখনও কখনও) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে এমন কোন কথা বলে ফেলে, অথচ সে নিজেও জানে না এর মূল্য কত বেশী। কিন্তু আল্লাহ এর বদৌলতে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে দেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১৩)*।

١٦- عَنْ أَنَس بْنِ مَالك عَنْ رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষার সাথে বড় পুরস্কার জড়িত। এবং আল্লাহ যখন কোন কওমকে ভালবাসেন তখন সে কওমকে পরীক্ষা করেন। অতঃপর যে ব্যক্তি সে পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, আর যে তাতে অসন্তুষ্ট থাকে, তার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৬৬, হাসান)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. লোকমান হেকীম তাঁর পুত্রকে বলেন, আমি তোমায় এমন বিষয়ে অছিয়ত করছি যা তোমাকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখবে। ১-তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থাপন করবে না। ২-তোমার পছন্দে-অপছন্দে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে।

২. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, فإن الخير كلّه في الرّضى، فإن استطعت أن ترضى وإلّا فاصبر 'আল্লাহ্র ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত। সুতরাং তুমি যদি পার আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্ট হও, নতুবা ধৈর্য ধারণ কর'।

৩. মাইমুন ইবনু মিহরান (রহঃ) বলেন, من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء 'যে ব্যক্তি তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকে না, তার নির্বুদ্ধিতার কোন প্রতিষেধক নেই'।

৪. রবী ইবনু আনাস (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন এমন ব্যক্তির আলামত হ'ল সে অধিকহারে যিকর করে। সুতরাং তুমি আল্লাহর অধিক যিকর ছাড়া অন্যকিছুকে ভালবাসতে পার না। আর তাক্বওয়ার আলামত হ'ল, গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্র প্রতি খুলুছিয়াত বজায় রাখা এবং কৃতজ্ঞতার আলামত হ'ল, আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর সিদ্ধান্তে প্রশান্তিবোধ করা।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ثمرة الرّضى: الفرح والسّرور بالرّبّ تبارك وتعالى 'সন্তুষ্টিবোধের ফলাফল হ'ল, প্রভুর প্রতি প্রফুল্লতা ও আনন্দচিত্ততা'।

৬. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, দাঊদ (আঃ) তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ)-কে উপদেশ দিয়ে বলেন, একজন ব্যক্তির তাক্বওয়া তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা–বিপদের সময় আল্লাহ্র প্রতি যথাযথ ভরসা রাখা, সর্বাবস্থায় তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং যা সে হারিয়েছে তার প্রতি অনাসক্তি বোধ করা।

সারবস্তু

১. সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই মুমিনের একমাত্র লক্ষ্য।

২. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়।

৩. এটা বান্দার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের দলীল।

৪. শেষ দিবসের সুসংবাদের অঙ্গিকার।

৫. আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে উত্তম ধারণার সৃষ্টি করে।

৬. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছনো যায়।

৭. সর্বোপরি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের উপকরণ।

তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত

-ড. আবু আমীনা বিলাল ফিলিপ্স
অনুবাদ : আবু হেনা

তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখা) :

এই শ্রেণীর তাওহীদের পাঁচটি প্রধান রূপ আছে-

১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে এককত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হ'ল, কুরআন এবং হাদীছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না। তিনি বলেন, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 'এবং মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারী যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। তাদের চারিদিকে অমঙ্গল চক্র, আল্লাহ তাদের প্রতি রাগ করেছেন, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। উহা কত নিকৃষ্ট আবাস' *(ফাত্হ ৬)*।

কাজেই ক্রোধ আল্লাহ্র গুণাবলীর একটি। এটা বলা ভুল হবে যে, যেহেতু ক্রোধ মানুষের মধ্যে একটি দুর্বলতার চিহ্ন যা আল্লাহর জন্য শোভন নয় সেহেতু আল্লাহর ক্রোধ অবশ্যই তাঁর শাস্তি বুঝায়। 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' *(শূরা ১১)*। আল্লাহ্র এই ঘোষণার ভিত্তিতে আল্লাহর ক্রোধ যে মানুষের ক্রোধের মত নয় তা গ্রহণ করতে হবে। তথাকথিত 'বিজ্ঞতাপূর্ণ' (rational interpretation) ব্যাখ্যা অনুযায়ী যখন যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, তখন তা নাস্তিকতার জন্ম দেয়।[১] কারণ আল্লাহ নিজেকে জীবন্ত বলে উল্লেখ করেছেন, সুতরাং যুক্তিবাদী বিচার অনুযায়ী স্রষ্টা নিষ্প্রাণ এবং অস্তিত্বহীন নয়। প্রকৃত ব্যাপার হ'ল আল্লাহর গুণাবলীর সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য শুধুমাত্র নামে, মাত্রায় নয়। যখন স্রষ্টাকে উদ্দেশ্য করে গুণাবলী ব্যবহৃত হয় তখন সেগুলি সার্বভৌম অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং বুঝতে হবে সে সেগুলি মানবসুলভ অসম্পূর্ণতা মুক্ত।

২. তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত-এর দ্বিতীয় রূপ হ'ল আল্লাহর উপর কোন নতুন নাম ও গুণাবলী আরোপ না করে তিনি নিজেকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবেই তাঁকে উল্লেখ করা। উদাহরণ স্বরূপ, যদিও তিনি বলেছেন যে তিনি রাগ করেন তথাপি তাঁর নাম আল্-গাযিব (রাগী জন) দেয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কেউ এই নাম ব্যবহার করেননি। এটা একটি ক্ষুদ্র বিষয় মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর অসত্য বা ভুল বর্ণনা রোধ করার জন্য তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ সসীম মানুষের পক্ষে কখনোই অসীম স্রষ্টার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত-এর তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী আল্লাহকে কখনোই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী দেয়া যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ, বাইবেল ও তাওরাতে দাবী করা হয় যে, আল্লাহ ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং তারপর সপ্তম দিনে নিদ্রা যান। এই কারণে ইহুদি ও খৃষ্টানগণ হয় শনিবার নতুবা রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসাবে নেয় এবং ঐ দিন কাজ করাকে পাপ বলে গণ্য করে। এই ধরনের দাবী স্রষ্টার উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করে। মানুষই গুরুভার কাজের পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সবলতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের ঘুমের প্রয়োজন হয়।[২] বাইবেল ও তাওরাতের অন্য জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ যেমন তার ভুল উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হয় তেমনি স্রষ্টাও তাঁর খারাপ চিন্তার জন্য অনুতপ্ত হন (I and the Lord repented of the evil which he thought to do to his people- Exodus 32: 14 *'এবং প্রভু অনুতপ্ত হলেন মানুষের অমঙ্গল করার চিন্তা করার জন্য*)।

অনুরূপভাবে স্রষ্টা একটি আত্মা অথবা তাঁর একটি আত্মা আছে বলে দাবী করা তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাতকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ কুরআনের কোন জায়গায় নিজেকে আত্মা বলে উল্লেখ করেননি অথবা তাঁর রাসূল (ছাঃ) হাদীছে ঐ ধরনের কোন বক্তব্য প্রদান করেননি। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ আত্মাকে তাঁর সৃষ্টির একটি অংশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করতে কুরআনের আয়াতকে মৌলিক নিয়ম হিসাবে অনুসরণ করতে হবে, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(আশ-শূরা ১১)*।

শ্রবণ ও দর্শন মানুষের গুণাবলী, কিন্তু যখন স্রষ্টার উপর আরোপিত করা হয় তখন সেগুলো তুলনাবিহীন এবং ত্রুটিমুক্ত। যাহোক এই গুণাবলী মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চোখ ও কান অপরিহার্য, যা স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয়। স্রষ্টা সম্বন্ধে মানুষ কেবলমাত্র ততটুকুই জ্ঞাত যতটুকু তিনি তাঁর নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং মানুষ এই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য। মানুষ যদি স্রষ্টার বর্ণনা দিতে লাগামহীন বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাহলে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির গুণাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মত ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়।

কল্পিত চিত্রের প্রতি আসক্তির কারণে খৃষ্টানরা মানুষ সদৃশ অগণিত চিত্র অঙ্কন, খোদাই এবং ঢালাই করে সেগুলিকে স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি নাম দিয়েছে। এইগুলি জনগণের মধ্যে যিশুখৃষ্টের দেবত্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সাহায্য করেছে। স্রষ্টা মানুষের মত, একবার এই কল্পনা গ্রহণযোগ্য হলে, যিশুখৃষ্টকে স্রষ্টা হিসাবে গ্রহণ করতে সত্যিকার কোন সমস্যা দেখা দেয় না।

৪. তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত-এর চতুর্থ রূপের জন্য প্রয়োজন মানুষের উপর আল্লাহ্র গুণাবলী আরোপ না করা। যেমন, বাইবেলের নতুন সংস্করণে (New Testament) পলকে (Paul) তাওরাতে (Genesis 14:18-20) বর্ণিত সালেমের রাজা মেলচিজদেকের রূপে দেখানো হয়েছে এবং তার ও যিশুখৃস্টের কোন আদি বা অন্ত নেই, এই বলে স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে-

'স্রষ্টার প্রধান পুরোহিত, সালেমের রাজা মেলচিজদেক রাজাদের বধ করার পর প্রত্যাগত আব্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং আব্রাহাম তাকে সব কিছুর এক দশমাংশ বিলি করে দিলেন। তাঁর নামের অর্থ হিসাবে তিনিই প্রথম ন্যায়নিষ্ঠার রাজা এবং সালেমেরও রাজা, অর্থাৎ শান্তির রাজা। তিনি পিতা অথবা মাতা অথবা বংশ বৃত্তান্ত এবং আদি অন্তবিহীন; কিন্তু স্রষ্টার পুত্রের সদৃশ হয়ে চিরদিন পুরোহিত হিসাবে বহাল থাকবেন *(Hebrews 7: 1-3, Holy Bible, Revised Standard Version)*।

সুতরাং যিশুখৃস্টও নিজেকে প্রধান পুরোহিত পদে পদোন্নতি দেননি কিন্তু তাঁর দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিলেন যিনি তাঁকে বললেন, তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্মদান করলাম'। যেমন তিনি অন্যখানেও বলেন, "মেলচিজ্দেকের পরে তুমি চিরদিনের জন্য পুরোহিত" *(Hebrews 5: 5-6 (Holy Bible, Revised Standard Version)*।

বেশীরভাগ শী'আ সম্প্রদায় (ইয়েমেনের যাইদিয়া ছাড়া) তাদের ইমামগণকে সম্পূর্ণভাবে ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে (মাসুম)[৩], অতীত, ভবিষ্যত

---

১. "rational interpretation" দ্বারা খুব সম্ভবত লেখক আবু আমিনাহ এটাই বলতে চেয়েছেন যে যেহেতু 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' *(শূরা ১১)* কাজেই আল্লাহ মানুষের মত এবং যেহেতু মানুষের প্রাণ আছে কাজেই আল্লাহর প্রাণ থাকতে পারে না। এই যুক্তির ফলেই একজন নাস্তিকতায় উপনীত হয়। কিন্তু এটা শুধু শব্দের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে সত্যের অপব্যাখ্যা- *অনুবাদক*।

২. এর বিপরীতে আল্লাহ কুরআনে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন, 'তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না'-*আল বাকারা ২৫৫*।

৩. মুহাম্মাদ রিযা আল্-মুযাফফর তার Faith of Shi'a Islam (U.S.A) Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, 2nd

ও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানী, ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম[৪] এবং সৃষ্টির অনু-পরমাণু নিয়ন্ত্রণকারী[৫] হিসাবে স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত করেছে। এঁটা করতে যেয়ে তারা সেই সব প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করেছে যারা নাকি স্রষ্টার অদ্বিতীয় গুণাবলীর অংশীদার এবং আল্লাহ্‌র সমমর্যাদাসম্পন্ন (!)।

৫. আল্লাহর নামের এককত্ব বজায় রাখার আরও অর্থ হ'ল যদি নাম্নে আগে আব্দ' (অর্থ ভৃত্য অথবা বান্দা) সংযোজিত না করা হয় তাহলে তার সৃষ্টিকে আল্লাহর কোন নামে নামকরণ করা যাবে না। কিন্তু 'রউফ' এবং 'রহীম' এর মত বহু স্বর্গীয় নাম মানুষের নাম হিসাবে অনুমোদিত কারণ রাসূল (ছাঃ)-কে উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লাহ এই ধরনের কিছু নাম ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 'তোমাদের মধ্যে হতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি দরদী (রউফ) ও পরম দয়ালু (রহীম)' *(আত-তওবা ৯ঃ ১২৮)*।

কিন্তু 'আর-রউফ' (যিনি সবচেয়ে সহমর্মিতায় ভরপুর) এবং 'আর রহীম' (সবচেয়ে ক্ষমাশীল) মানুষের ব্যাপারে তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন নামের আগে আবদ ব্যবহার করা হবে, যেমন আব্দুর-রউফ অথবা আব্দুর রহীম। আর-রাউফ এবং আর-রহীম এমন এক পূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। তেমনিভাবে, আব্দুর রাসূল (বার্তাবাহকের গোলাম), আব্দুন নবী (রাসূলের গোলাম), আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের গোলাম) ইত্যাদি নামগুলি নিষিদ্ধ, কারণ এখানে মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের গোলাম হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই কারণে রাসূল (ছাঃ) মুসলিমদের তাদের অধীনস্থদের 'আবদী' (আমার গোলাম) অথবা 'আমাতী' (আমার বাঁদী) বলে উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৬০)*।

তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত-এ শিরক

এই শ্রেণীর শিরকে আল্লাহর উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করার সাধারণ পৌত্তলিক প্রথা এবং একই সাথে সৃষ্ট বস্তুর উপর আল্লাহর নাম ও গুণাবলী আরোপ করা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

(ক) মানবিকীকরণ দ্বারা শিরক

আসমা ওয়াছ-ছিফাতের এই শিরকের রূপ হল আল্লাহকে মানুষ ও জন্তুর আকার ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা। পশুর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মূর্তিপূজারীরা সাধারণভাবে সৃষ্টিতে স্রষ্টার প্রতীক ব্যবহার করতে মানুষের আকার ব্যবহার করে। ফলে প্রায়ই তারা যাদের পূজা করে তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট মানুষের আকারে স্রষ্টার প্রতিকৃতি অংকন করে, ছাঁচ এবং খোদাই তৈরী করে। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু ও বৌদ্ধরা এশিয়ার লোক সদৃশ অগণিত মূর্তি পূজা করে এবং এই সব মূর্তিকে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রকাশ হিসাবে গণ্য করে। আধুনিক খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, পয়গম্বর যিশু মূর্তিমান স্রষ্টা ছিলেন। স্রষ্টা যে তাঁর নিজের সৃষ্টি এটা সেই ধরনের শিরক এর উদাহরণ। তথাকথিত অসংখ্য প্রসিদ্ধ খৃস্টান চিত্রকরদের মধ্যে মাইকেল এ্যাঞ্জেলো বিখ্যাত ছিলেন (Michaelangelo, মৃঃ ১৫৬৫ খ্রি)। তিনি ভ্যাটিক্যানে অবস্থিত সিসটিন গির্জার (Sistine Chapel) ছাদে স্রষ্টাকে এঁকেছিলেন লম্বা ঝুলে পড়া চুল দাড়ি বিশিষ্ট একজন উলঙ্গ ইউরোপীয় বৃদ্ধ হিসাবে। কালক্রমে এই সব চিত্র খৃস্টান জগতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু বলে বিবেচিত হয়।

(খ) দেবত্ব আরোপের দ্বারা শিরক

আসমা ওয়াছ-ছিফাতের এই ধরনের শিরক এমন বিষয় সম্পর্কিত যেখানে সৃষ্টিকৃত জীবন্ত প্রাণী অথবা বস্তুকে আল্লাহর নাম অথবা তাঁর গুণাবলী আরোপ করা হয়। যেমন যেসব মূর্তির নাম আল্লাহর নাম থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল যেসব মূর্তি পুজা করা প্রাচীন আরবদের প্রথা ছিল। তাদের প্রধান তিন মূর্তি হল আল্লাহর নাম আল-ইলাহ থেকে নেয়া আল-লাত্, আল আজিজ থেকে নেয়া আল উজ্জাহ এবং আল্ মান্নান থেকে নেয়া আল-মানাত। রাসূল মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর যুগে ইয়ামামা এলাকায় একজন মিথ্যা নবীও ছিল, যে 'রহমান' নাম গ্রহণ করেছিল, যে নাম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য।

সিরিয়ার শী'আদের মধ্যে 'নুসাইরিয়াহ' নামের সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, রাসূল মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর চাচাতো ভাই ও জামাত আলী ইব্নে আবি তালিবের মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ ছিল এবং তাঁর উপর আল্লাহর অনেক গুণ আরোপিত করেছিল। এদের মধ্যে ইসমাইলীরা যারা আগাখানি বলেও পরিচিত, তারা তাদের নেতা আগা খানকে স্রষ্টার প্রকাশ বলে মনে করে। লেবাননের দ্রুজরাও এই শ্রেণীভুক্ত, যারা বিশ্বাস করে যে ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিম বিন আমরিল্লাহ মনুষ্য জাতির মধ্যে আল্লাহর শেষ প্রকাশ।

আল-হাল্লাজের মত ছূফীদের (মরমীবাদী মুসলিম) দাবী যে, তারা স্রষ্টার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে তারা স্রষ্টার প্রকাশ হিসাবে বিরাজ করছে, তাদের এই দাবিও আসমা ওয়াছ-ছিফাতের শ্রেণীভুক্ত শিরক এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আধুনিক দিনের আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসীগণ যেমন শার্লী ম্যাকলিন (Shirley Maclaine) জে, জে, নাইট (J. Z. Knight) প্রায়শই নিজেদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উপর দেবত্ব দাবি করে। বহুল পঠিত আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব ($E = mc^2$, শক্তি সমান ভর গুনন আলোর গতির বর্গফল) প্রকৃতপক্ষে আসমা ওয়াছ-ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত শিরকের অভিব্যক্তি। এই তত্ত্ব মতে শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনটাই করা যায় না। শুধুমাত্র শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হয় অথবা পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যাহোক পদার্থ এবং শক্তি উভয়ই সৃষ্ট অস্তিত্ব এবং উভয়কেই ধ্বংস করা হবে। আল্লাহ যেমন স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন- اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 'আল্লাহ সমস্ত কিছুরই স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুরই বিধায়ক' *(যুমার ৩৯ঃ ৬২)*। তিনি আরো বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে' *(রহমান, ৫৫ঃ ২৬)*।

এই তত্ত্বের আরও অর্থ এই যে, পদার্থ এবং শক্তি চিরন্তন যার কোন শুরু অথবা শেষ নেই, যেহেতু এ দু'টির জন্ম নেই এবং একটার থেকে অন্যটায় রূপান্তরিত হয় বলে ধরা হয়। যাহোক, এই স্বাভাবিক গুণ শুধু আল্লাহর এবং তিনি একমাত্র যাঁর শুরু অথবা শেষ নেই।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বও স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাণহীন পদার্থ হতে প্রাণ এবং আকারের বিবর্তন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেবার একটা প্রচেষ্টা। এই শতাব্দীর একজন শীর্ষ ডারউইনতাত্ত্বিক স্যার আলডাস হাক্সলি তাঁর চিন্তাধারা নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করেছেন- 'ডারউইনতত্ত্ব, প্রাণী সত্ত্বার সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্রষ্টার ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় আলোচনার পরিমণ্ডল থেকে দূর করে দিয়েছে।[৬] অর্থাৎ ডারউইনতত্ত্ব স্রষ্টার অস্তিত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

---

ed, 1983). শীর্ষক বইতে উল্লেখ করেছেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, রাসূলের মত, একজন ইমাম অবশ্যই ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে অর্থাৎ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য, পরিকল্পিতভাবে অথবা অপরিকল্পিভাবে ভুল করা অথবা অন্যায় করায় অক্ষম। কারণ ইমামগণ ইসলামের সংরক্ষক এবং এটা তাদের অধীনে সুরক্ষিত; পৃষ্ঠা ৩২। আরও দেখুন- Islam (Teheran: A Group of Muslim Brothers, 1973), p 35, by Sayed Saeed Akhtar Rizvi.

৪. আল মুযাফফর আরো উল্লেখ করেছেন, আমরা বিশ্বাস করি যে ইমামগণের অনুপ্রেরণা পাবার ক্ষমতা উৎকর্ষতা চূড়ান্ত শিখরে পৌছেছে এবং আমরা এটাকে স্বর্গীয় ভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা বলি। এই ক্ষমতা বলে ইমাম সুশৃঙ্খল যুক্তিতর্ক অথবা কোন শিক্ষকের পথ নির্দেশ ছাড়াই যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে সক্ষম।

৫. খোমেনী বলেন, 'নিশ্চয়ই ইমামের একটি সম্মানজনক অবস্থান, সুউচ্চ পদমর্যাদা, সৃজনশীল খেলাফত এবং সৃষ্টির সকল পরমাণুর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রাধান্য রয়েছে'। (Aayatullah Musavi al-khomeini, al-Hukoomah al-Islaameyah, Beirut: at Taleeiah press, Arabic ed, 1979, p 52).

৬. *Quoted in Francis Hitchingis the Neck of the Giraffe, (New York: Ticknor and Fields, 1982), p 245 from Tax and Callender, 1960, vol III p 45*।

রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা : জাহেলী যুগ ও বর্তমান যুগ

-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

মানব জাতির ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে আদমই (আঃ) তাদের আদি পিতা। আর তাঁরই হতে হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা অগণিত বনু আদম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যখন মানুষ স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে বিপথগামী হতে বসেছে, তখনই অসীম দয়ালু আল্লাহ তাদেরকে সত্য পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলদেরকে এ ধরাপৃষ্ঠে পাঠিয়েছেন। আর এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। যাকে মহান রব্বুল আ'লামীন অমায়িক চরিত্রের ভূষণে ঢেলে সাজালেন। চারিত্রিক এমন কোন গুণ অবশিষ্ট ছিল না যা তাঁর চরিত্রে অনুপস্থিত। সে সুরেরই প্রতিধ্বনি শুনা যায় মহান আল্লাহ্‌র বাণীতে- وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'আপনি অবশ্যই মহত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত' *(কলম ৪)*। যাঁকে বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্রের সনদ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাঁর শানে নূন্যতম বদনাম অশোভনীয়। আর যারা এরূপ হীন কাজে জড়াবে তারা কোন শ্রেণীর সৃষ্টি জীব তা ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাঁর সম্পর্কেও বর্তমান সময়ের কিছু নাস্তিক অশালীন ভাষায় কটূক্তি করে পরিবেশ নষ্ট করতে চাচ্ছে। এ যে ইহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের অংবিশেষ তা কে না জানে। পাশ্চাত্যের মদদপুষ্ট পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত মুসলিম নামধারী নাস্তিক সালমান রুশদী, ভারতের দাউদ হায়দার, বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত তসলিমা নাসরীন ও তরুণ প্রজন্মের শাহবাগী নাস্তিক ব্লগাররা যে একই দাবার গুটি তা ধর্মপ্রাণ মানুষের বুঝতে আর বাকী নেই। আর গুটি কয়েক নাস্তিকদের খুশি করতে গিয়ে অনেক সময় প্রশাসনযন্ত্রও তাদের শেল্টার দিয়ে থাকে যা অনভিপ্রেত। কেননা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে ইসলামী চেতনা মিশে রয়েছে প্রতিটি মুসলিমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাসলীমা নাসরিনকে এ দেশের মানুষ দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছিল। সে দিন আপামর মুসলিম জনতা প্রতিবাদী কণ্ঠে রাজপথে নেমেছিল। সেই ঈমানী চেতনা দেশের মানুষের হৃদয় থেকে মুছে যায়নি। এ বাস্তবতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবমাননাকারী নাস্তিকদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কারণ ঐসব নাস্তিকদের তুলনায় দেশে ধর্মপ্রাণ আস্তিকদের তুলনা এতই বেশী যে, তা তুলনা করাও বোকামী। তেজোদীপ্ত ঈমানের বলে বলিয়ান মুসলিম জনগণ ফুঁসে উঠলে অবমাননাকারী নাস্তিকদের পরিণতি কি হবে তা সময়ই বলে দিবে। শেষ পর্যন্ত পালানোর রাস্তাটুকু পাবে না। এক শ্রেণীর মুসলমান পাশ্চত্যের পাতানো ফাঁদে পা রেখে তথাকথিত 'উদারতা' দেখাতে গিয়ে স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা পর্যন্ত ভুলতে বসেছে। ছলে বলে কৌশলে নাস্তিকদের বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিচ্ছে আমরা কি মুসলিম নই? আমরা কি ছালাত পড়ি না? তোমার ঈমানে উইপোকা বাসা বেঁধেছে তা চির সত্য কথা। কেননা ঈমান ও নাস্তিক্যবাদ কোন দিন এক হতে পারে না। যা সুমেরু ও কুমেরুতে অবস্থানকারী পরস্পর বিরোধী কাজ। একটি অপরটির ঘোর বিরোধীও বটে। দেশের সরকার ও জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর সময়ের একান্ত দাবী। অন্যথা এলাহী গযব পতিত হলে তখন কেউ তা থেকে রেহাই পাবে না। সকলকে তার স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তাই সময় থাকতেই সাবধান হোন। বর্তমান প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবমাননা করার ক্ষেত্রে জাহেলী যুগ ও বর্তমান যুগের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

এক শ্রেণীর মুসলমান পাশ্চত্যের পাতানো ফাঁদে পা রেখে তথাকথিত 'উদারতা' দেখাতে গিয়ে স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা পর্যন্ত ভুলতে বসেছে। ছলে বলে কৌশলে নাস্তিকদের বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিচ্ছে আমরা কি মুসলিম নই? আমরা কি ছালাত পড়ি না? তোমার ঈমানে উইপোকা বাসা বেঁধেছে তা চির সত্য কথা। কেননা ঈমান ও নাস্তিক্যবাদ কোন দিন এক হতে পারে না। যা সুমেরু ও কুমেরুতে অবস্থানকারী পরস্পর বিরোধী কাজ। একটি অপরটির ঘোর বিরোধীও বটে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে বিভিন্ন অপবাদ :

মক্কার কাফির-মুশরিকরা যখন নবী করীম (ছাঃ)-কে আদর্শিক দিক দিয়ে মুকাবিলা করতে পারছিল না, তখন তারা ভিন্ন পথ খুঁজতে থাকে। তারা ভাবতে থাকে ইসলামের উত্তাল তরঙ্গ কিভাবে স্তব্ধ করা যায়। সে লক্ষ্যে তারা বেছে নেয় গাল-মন্দের পথ ও কুৎসা রটনা সহ বিভিন্ন অশালীন কথার দ্বারা তাঁর নির্মল চরিত্রে কালিমা লেপনের ঘৃণ্য পথ। তাদের বিশ্বাস এ অস্ত্রের আঘাতেই তাঁকে ধরাশায়ী করা সম্ভব। ভিনদেশী লোকেরা দ্বীন গ্রহণ করতে এসে তাঁর বদনাম শুনে ইসলাম গ্রহণ না করে নিজ দেশে ফিরে যাবে। আর যদি তারা যাচাই-বাছাই করতে আসে তাহলে ঘুরে ফিরে তাদের কাছেই তো আসতে হবে। তখন তারা তাদের মগজ ধোলাই করেই ছাড়বে। কাফির-মুশরিক কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেয়া গালি ও মিথ্যা অপবাদ সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

জাহেলী যুগের কাফের-মুশরিকদের দেয়া অপবাদ সমূহ :

(১) পাগল (২) কবি : তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পাগল বা কবি হিসাবে প্রচার করতে থাকে। যেন মানুষ তার কাছে না যায় এবং তাঁর নিকট অবতারিত অহী তথা কুরআনুল কারীম থেকে দূরে থাকে। কেননা পাগলের কথায় কেউ কান দেয় না। আর যদি পবিত্র কুরআন কবির কবিতা হয় তাহলে অহীর ভিন্ন কোন মর্যাদাও থাকে না। তাই তারা এ নোংরা পথ বেছে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ 'যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) মা'বূদ নেই তখন তারা অহংকার করত এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বূদদেরকে বর্জন করব' *(ছাফফাত ৩৭/৩৫-৩৬)*।

(৩) জাদুকর ও (৪) মহা মিথ্যাবাদী : নবী করীম (ছাঃ)-কে তারা জাদুকর ও মিথ্যাবদী হিসাবে প্রচার করে। কেউ যেন তাঁর কথা না শুনে। পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেত। আর এটাকেই তারা জাদুকরী প্রভাব বলে সমাজে প্রচার করতে থাকে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে পারলে তাঁর প্রচারিত দ্বীন 'ইসলাম' কেউ গ্রহণ করবে না। এই ভেবে তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী অপবাদ আরোপ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 'তারা আশ্চর্যবোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন

সতর্ককারী আসল এবং কাফিররা বলে, এতো এক জাদুকর ও মিথ্যাবাদী' *(ছোয়াদ ৩৮/৪)*।

(৫) পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী : তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআনুল কারীমকে তারা পূর্ববর্তী লোকদের কল্পকথা বলে প্রচার চালিয়ে ছিল। তারা বলে, এসব আগেকার মানুষের অলিক কাহিনী। পবিত্র কুরআনের 'আহসানুল কাছাছ' তথা সর্বোত্তম শিক্ষণীয় ঘটনাগুলোকে তারা অতীতের রূপকথার কাহিনী বলে চালিয়ে দিয়েছিল। যেন পবিত্র কুরআন থেকে মানুষ অনেক দূরে অবস্থান করে। কেউ যেন এর ধারে কাছেও যেতে না পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَـذَا إِلَّـا أَسَـاطِيرُ الْـأَوَّلِينَ 'তাদেরকে যখন আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনানো হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, নিঃসন্দেহে এটা পূর্ববর্তীদের মিথ্যা রচনা (উপকথা) ছাড়া আর কিছু নয়' *(আনফাল ৮/৩১)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 'তারা বলে, এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়' *(ফুরক্বান ২৫/৫)*।

(৬) অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী : তারা নবী করীম (ছাঃ)-কে অন্যের সহযোগিতায় মিথ্যারোপকারী বলে প্রচার করতে থাকে। তারা দাবী করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম মিথ্যা। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সাহায্যে এ মিথ্যা বাণী প্রস্তুত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًـا وَزُورًا 'কাফিররা বলে, এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে; এইরূপে তারা অবশ্যই যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে' *(ফুরক্বান ২৫/৪)*।

(৭) মিথ্যা রটনাকারী : রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যা রটনাকারী বলে অভিহিত করেছিল। ক্ষেত্র বিশেষে মহান আল্লাহ কখনও কোন বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন কোন বিধান নাযিল করলে তারা বলত, তিনি মিথ্যা উদ্ভাবনকারী না হলে এরূপ পরিবর্তন কেন হচ্ছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُـونَ 'আমি যখন কোন এক আয়াত পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন, তখন তারা বলে, তুমি তো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না' *(নাহাল ১৬/১০১)*।

(৮) ভবিষ্যদ্বক্তা : তারা নবী করীম (ছাঃ)-কে গনক বা ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে চিত্রিত করতে থাকে। আর এসবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যেন তাঁর প্রচারিত দ্বীন তথা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অনেক সময় তাদের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কথাগুলো আল্লাহ জিবরীল মারফতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানিয়ে দিতেন। তখন তারা বলত এ তো দেখছি ভবিষ্যদ্বক্তা বা জৌতিষী। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُـونٍ 'অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উন্মাদও নও' *(তূর ৫২/২৯)*।

(৯) ফেরেশতা নয়, এতো সাধারণ মানুষ : তারা নবী (ছঃ)-কে সাধারণ মানুষ বলে তাঁর নবুওয়াতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলে। কেননা তিনি নবী হলে তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা নেই কেন? যে তাঁর সত্যায়নকারী হত। তারা মনে করত নবী কোন সাধারণ মানুষ হতে পারে না। তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে কেউ হবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَـا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا 'তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না, যে তার সাথে থাকতো সতর্ককারীরূপে? *(ফুরক্বান ২৫/৭)*।

(১০) পথভ্রষ্ট : তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উল্টো তারাই নবী করীম (ছাঃ)-কে পথভ্রষ্ট বলে গালি-গালাজ করত। তাদের দৃষ্টিতে তারাই হক্ব পন্থী এবং নবী করীম (ছাঃ) ও মুমিনরাই বিপথগামী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ 'এবং যখন তাদেরকে (মুমিনদেরকে কাফিররা) দেখত তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট' *(মুতাফ্ফিফীন ৮৩/৩২)*।

(১১) বেদ্বীন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বেদ্বীন বা ধর্মত্যাগী বলে তাদের প্রচারণা চালাত। ফলে তারা স্বীয় ধর্মীয় লোকদের ক্ষিপ্ত করে তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কারণ হিসাবে তারা বলত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম তথা ইসলাম গ্রহণ করে বেদ্বীন হয়ে গেছে। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় হাজীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন আবু লাহাব তাঁর পিছনে পিছনে বলছিল, 'তোমরা তাঁর কথা শুনবে না, সে হচ্ছে মিথ্যাবাদী বেদ্বীন' *(আর-রাহীকুল মাখতূম, ১৭তম সংস্করণ ২০০৫ইং, পৃঃ ৮৬)*। জাহেলী যুগের মানুষদের প্রচারণায় অবাক না হয়ে পারা যায় না। যিনি বেদ্বীন মানুষকে সঠিক দ্বীন তথা ইসলামে ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য নিরলসভাবে দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁকেই শুনতে হয়েছে ধর্মত্যাগী নামক নোংরা গালি।

(১২) পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী (১৩) জামা'আত বিভক্তকারী : তারা পূর্ব পুরুষদের ধর্ম বিনষ্টকারী ও ঐক্য বিনষ্টকারী হিসাবে সমাজের মাঝে প্রচারণা চালায়। জাহেলী যুগে কুরাইশ নেতারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবু তালিবের নিকট গিয়ে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ করে। এ সব অভিযোগ করে ইসলামের দাওয়াতী মিশন নিস্তব্ধ করতে চেয়েছিল। প্রকারান্তরে তারা নবী করীম (ছাঃ)-কে নিয়ে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা স্বীয় চাচার কাছে অভিযোগ করে যে, 'আপনার পিতা-পিতামহের বিরোধিতা করছে, আপনার জাতির ঐক্য ছিন্নভিন্ন করছে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তাকে নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করছে। (তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন) আমরা তাকে হত্যা করব' *(আর-রাহীকুল মাখতূম, ১৭তম সংস্করণ ২০০৫ইং, পৃঃ ৯৪)*।

(১৪) জাদুগ্রস্ত : তারা নবী করীম (ছাঃ)-কে জাদুগ্রস্ত হিসাবে সমাজে প্রচার করতে থাকে। যেন তার কথায় কেউ কর্ণপাত না করে। জাদুগ্রস্ত মানুষের কথায় কেউ কর্ণপাত করে না তাই তারা এ পথ বেছে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِـهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّـا رَجُلًـا مَسْحُورًا 'যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন তারা কেন কান পেতে তা শুনে তা আমি ভাল করে জানি এবং (এটাও জানি) গোপনে আলোচনাকালে যালিমরা বলে, তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ মাত্র' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৪৭)*।

(১৫) 'রা'ইনা : অস্পষ্ট নাম ব্যবহার করে মনের ঝাল মিটাতে থাকে। মানুষকে কষ্ট দেয়ার জন্যই সাধারণত তার নাম বিকৃত করা হয়। এক্ষেত্রে তারাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিকৃত নাম ধরে ডাকতে শুরু করে। যেমনভাবে আল্লাহ মুমিনদের ডাক দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِـيمٌ 'হে

মুমিনগণ! তোমরা ‘রা‘ইনা’ (বিশেষ একটা গালি) বল না বরং ‘উনযুরনা’ (আমাদের প্রতি নেক দৃষ্টি দিন) বল এবং শুনে নাও, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(বাক্বারা ২/১০৪)*। মদীনায় হিজরত করার পর সেখানকার দুরাচার ইহুদীরা রাসূলকে ‘রা‘ইনা’ বলে ডাকত। তাদের মাতৃভাষা হিব্রুতে যার অর্থ ‘আমাদের দুষ্ট ব্যক্তিটি’।

সভ্য যুগের তথাকথিত মুসলিমদের দেয়া অপবাদ সমূহ :

বর্তমান সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালি দেয়া ও ইসলাম সম্পর্কে অবমাননা করার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যুব সমাজ এই আত্মঘাতী পিচ্ছিল পথে পা রাখছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র খোদ বাংলাদেশও এর হিংস্র ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। কখনো ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। কখনো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশিকা পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথ প্রচার করছে। আবার কখনো বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলার নামে অশালীন তথ্য পরিবেশন করছে। আবার কখনো বা বিশ্বের সর্বোত্তম চরিত্রের অনুসরণীয় মহান ব্যক্তিত্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি ছড়াচ্ছে। বাংলাদেশে যেভাবে এই ছোঁয়াচে ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে তা রীতিমত উদ্বেগের বিষয়। হাতেগোণা কয়েকজন নাস্তিকের দৌরাত্মে আজ দেশের পরিবেশ অস্থিতিশীল। লাখো মুমিনের হৃদয়ে আঘাত হেনে তারা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। যে ক্ষত থেকে প্রতিনিয়ত বেদনার অব্যক্ত অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। যা পর্যায়ক্রমে প্রতিবাদে রূপলাভ করেছে। দেশের মানুষ ফুঁসে উঠেছে, নেমেছে রাজপথে নাস্তিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করার দাবি নিয়ে। এর পরও যদি প্রশাসনযন্ত্র জেগে জেগে ঘুমায় তাহলে বুঝতে আর বাকী থাকে না তাদের নেপথ্যে রয়েছে ঐ ক্ষমতাধর নেতারাই? যারা সবকিছু জানার পরও কেউবা না জানার ভান করছে। আবার কেউ বা বিভিন্ন খোঁড়াযুক্তি দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা করছে। আবার নেতাদের অনেকে একে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। সময় এসেছে এর সুষ্ঠু সমাধান করার। যা সকল মুসলিম হৃদয়ের একান্ত দাবী।

ব্লগার রাজীব হায়দার নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক অজানা নোংরা তথ্য বেরিয়ে আসে। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র এবং ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে অতি জঘন্য লেখা প্রকাশের অভিযোগ উঠে। পত্র-পত্রিকায় এ সকল কুরুচিপূর্ণ লেখা প্রকাশ হওয়ায় দেশব্যাপী এই নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তির দাবী এবং ঘৃণা ও নিন্দার ঝড় অব্যাহত রয়েছে। ঐ ব্যক্তি তার ব্লগে গত বছরের জুন মাস থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ‘মোহাম্মক’ (মহা-আহম্মক), উম্মতে মুহাম্মদীকে ‘উম্মক’ (উম্মত+আহম্মক), মোহরে নবুঅতকে রাসূল (ছাঃ)–এর কাঁধে খাদীজার পেন্সিল হিল জুতার আঘাতের চিহ্ন বলে প্রচারণা চালাচ্ছে *(মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০১৩ইং, পৃঃ ৪৩)*।

আইটি বিশেষজ্ঞসহ কয়েকজন আলেম কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুসন্ধান কমিটিকে প্রদত্ত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা আসিফ মহিউদ্দিন ইসলামবিদ্বেষী অন্যতম নাস্তিক ব্লগার। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আসিফ নিজেকে খোদা দাবি করেছে। মসজিদ সম্পর্কে সে লিখেছে, ‘ঢাকা শহরের সব মসজিদকে পাবলিক টয়লেট বানানো উচিত’ *(নাঊযুবিল্লাহ)*! *(দৈনিক আমার দেশ, ২ এপ্রিল ২০১৩ইং, পৃঃ ১, কলাম ৬)*।

তাছাড়া আসিফ তার ব্লগে রাসূল (ছাঃ)-কে নারী লোলুপ চরিত্রে চিত্রিত করতে চেয়েছে *(নাঊযুবিল্লাহ)*! বেহেশতে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত হুরদের সম্পর্কেও সে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় অশালীন মন্তব্য করেছে। এমনকি সে, বিশ্ব জগতের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহকেও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি *(দৈনিক আমার দেশ, ২ এপ্রিল ২০১৩ইং, পৃঃ ২, কলাম ৫)*। তার ব্যবহৃত ভাষাগুলো এতটাই নোংরা যে, অত্র প্রবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

ইতিপূর্বে দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক পবিত্র কুরআনের ব্যাঙ্গাত্মক অনুবাদ করে ‘ছহি রাজাকারনামা’ নামক প্রবন্ধ লিখে। সে পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতের অনুবাদ ‘সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য’ এর পরিবর্তে ‘সমস্ত প্রশংসা রাজাকারগণের’ করে। অপর একটি আয়াত ‘আমরা তোমরাই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই’ এর অনুবাদের পরিবর্তে সে লিখেছে, ‘আর তোমরা রাজাকারের প্রশংসা কর, আর রাজকারদের সাহায্য প্রার্থনা কর’। সূরা নাবার ৩১-৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ‘পরহেযগার লোকদের জন্য রয়েছে মহা সাফল্য। (তা হচ্ছে) বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর (ফলের সমারোহ)। (আরো আছে) পূর্ণ যৌবনা সমবয়সী সুন্দরী তরুণী’। সে এর ব্যঙ্গ অনুবাদ লিখেছে, ‘আর তাহাদের জন্য সুসংবাদ। তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে রাষ্ট্রের শীর্ষপদ আর অনন্ত যৌবনা নারী আর অনন্ত যৌবন তরুণ। কে আছে, যে উত্তম সন্দেশ, মসৃণ তলদেশ ও তৈলাক্ত গুহ্যদেশ পছন্দ করে না’ *(দৈনিক আমার দেশ, ২৮ মার্চ ২০১৩ ইং, পৃঃ ৪, কলাম ৫)*। অবশ্য আনিসুল হকের এ লেখাটি প্রথম প্রকাশ পায় **১৯৯১** সালের **১২** এপ্রিল পূর্বাভাস পত্রিকায়। **১৯৯৩** সালে লেখাটি আনিসুল হকের ‘গদ্যকার্টুন’ বইতে স্থান পায়। **২০১০** সালে বইটি সন্দেশ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পুনরায় প্রকাশ করে।

ইতিপূর্বে **২০১০** সালের **১৪** মার্চ মানিকগঞ্জ যেলার ঘিওরের ত্বরা জনতা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিত মজুমদার দশম শ্রেণীতে পড়ানোর সময় বলে, ‘কুরআন শরীফ মানুষের বানানো সাধারণ একটি বই। মুহাম্মাদ (ছাঃ) একজন অপবিত্র মানুষ। তার মায়ের বিয়ের ৬ মাস আগেই মুহাম্মাদের জন্ম হয় *(নাঊযুবিল্লাহ)*! অবশ্য পরবর্তীতে জনরোষে পড়ে সে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় *(মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০১০, পৃঃ ৪১-৪২)*।

এছাড়া মহানবী (ছাঃ)-এর কার্টুন পুনঃপ্রকাশ করে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার কারণে অনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছিল ডেনমার্কের পত্রিকা পলিতিকান *(মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০১০, পৃঃ ৪২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে কটূক্তিকারীদের শারঈ বিধান :

কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবমাননা করলে সে ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে। যা হত্যাযজ্ঞ অপরাধ। পাশাপাশি কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তা ত্যাগ করলে অথবা এমন কর্ম করলে যা দ্বারা ধর্মত্যাগী হিসাবে গণ্য হয় তাহলে তাকেও ইসলামের বিধান অনুযায়ী হত্যা করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে (ফিতনা) অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদের কে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ান হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে, অথবা নির্বাসনে পাঠানো হবে। এটা তো ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর পরকালেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে’ *(মায়িদা ৫/৩৩)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘যদি তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ধৃত হওয়ার আগে তওবা করে, তবে এ ধরনের তওবা করার কারণে,

শরী'আতের যে নির্দেশ তার প্রতি ওয়াজিব হয়ে যায়, তা মাফ হয় না' *(আবুদাঊদ হা/৪৩৭২, সনদ হাসান।)*।

অত্র আয়াতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে কটূক্তিকারী ও নাস্তিক-মুরতাদদের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। তাদের এ শাস্তি মওকুফের কোন সুযোগ নেই। তারা মৃত্যুরপূর্বে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাদের তিনি চাইলে ক্ষমা করতে পারেন। এতে করে তাদের পরকালীন শাস্তি আল্লাহ মওকুফ করবেন। তবে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে দুনিয়াবী শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا 'নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য ইহকালে-পরকালে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে অভিশাপ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(আহযাব ৫৭)*। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-কে যে কোনভাবে কষ্ট দিলে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ অত্র আয়াতে সে কথারই প্রতিধ্বনি শুনা যায়। আর তাদের জন্য উভয় জগতে রয়েছে অভিশাপ। পাশাপাশি পরকালে অপমানকর আবশ্যিক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষমাণ।

অনুরূপভাবে হাদীছেও তাদের শাস্তির একই বিধান পরিলক্ষিত হয়। যেমনটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে- عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لأَحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ. وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. ইকরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রাঃ) ঐ সব লোকদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন, যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এ সংবাদ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, যদি আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে আমি তাদের আগুনে জ্বালাতে দিতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির (বস্তু) দ্বারা কাউকে শাস্তি দিবে না। অবশ্য আমি তাদেরকে আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করতাম। কেননা, তিনি বলেছেন, যদি দ্বীন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে' *(ছহীহ বুখারী হা/৩০১৭; আবুদাঊদ হা/৪৩৫১; ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৫; তিরমিযী হা/১৪৫৮; নাসাঈ হা/৪০৬০; মিশকাত হা/৩৫৩৩, সনদ ছহীহ।)*। অত্র হাদীছে বুঝা যায় আলী (রাঃ) মুরতাদদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। অবশ্য ইবনু আব্বাস (রাঃ) আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করাকে পছন্দ করেননি। তবে তিনিও মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেই রায় দেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, যে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল'। তবে তিনটির মধ্যে যে কোন একটির কারণে তার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল : (১) যদি কেউ বিবাহ করার পর যেনা করে, তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হবে, তাকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা দেশান্তর করা হবে এবং (৩) যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে, তার জীবনের বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৩৫৩; মিশকাত হা/৩৫৪৪, সনদ ছহীহ।)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়। প্রথমত : যে ব্যক্তি বিবাহিত জীবন যাপনের সুযোগ লাভের পর কোন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাকে হত্যা করা বৈধ। তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। এটা তার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। কোন ব্যক্তি এরূপ নোংরা কাজে যেন ধাবিত না হয়, তাই তার জন্য এই কঠিন শাস্তি। দ্বিতীয়ত : যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে অর্থাৎ হদ কায়েম বা ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়ায় হত্যা করা তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে। মানব সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে এটাই ইসলামের চূড়ান্ত বিধান। তৃতীয়ত : কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আবার তা ত্যাগ করলে তাকেও হত্যা করা হবে।

ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন এক অন্ধ ব্যক্তির একটি দাসী ছিল। সে নবী করীম (ছাঃ)-এর শানে বেআদবীসূচক কথাবার্তা বলতো। সে অন্ধ ব্যক্তি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতো, কিন্তু সে তা মানতো না। সে ব্যক্তি তাকে ধমকাতো, তবু সে তা থেকে বিরত

হতো না। এমতাবস্থায় এক রাতে যখন সে দাসী নবী (ছাঃ)-এর শানে অমর্যাদাকর কথাবার্তা বলতে থাকে, তখন ঐ অন্ধ ব্যক্তি একটি ছোরা নিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে, যার ফলে সে দাসী মারা যায়। এ সময় তার এক ছেলে তার পায়ের উপর এসে পড়ে, আর সে যেখানে বসে ছিল, সে স্থানটি রক্তাক্ত হয়ে যায়। পরদিন সকালে এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আলোচনা হয়, তখন তিনি সকলকে একত্রিত করে বলেন, আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই এবং এটা তার জন্য আমার হক্ব স্বরূপ। তাই, যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। সে সময় অন্ধ লোকটি লোকদের সারি ভেদ করে প্রকম্পিত অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে গিয়ে বসে পড়ে এবং বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার হন্তা। সে আপনার সম্পর্কে কটূক্তি ও গালি-গালাজ করতো। আমি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতাম ও ধমকাতাম। কিন্তু সে তার

প্রতি কর্ণপাত করতো না। ঐ দাসী থেকে আমার দু'টি সন্তান আছে, যারা মণি-মুক্তা সদৃশ এবং সেও আমার খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু গত রাতে সে যখন পুনরায় আপনার সম্পর্কে কটূক্তি গাল-মন্দ করতে থাকে, তখন আমি আমার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং ছোরা দিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে হত্যা করি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক যে, ঐ দাসীর রক্ত ক্ষতিপূরণের অযোগ্য বা মূল্যহীন *(আবুদাউদ হা/৪৩৬১; নাসাঈ হা/৪০৭০, সনদ ছহীহ।)*। অত্র হাদীছে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মানব মুক্তির অগ্রদূত নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে ব্যঙ্গ বা কটূক্তিকারীর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। কোন ব্যক্তির জন্য তাঁর পূত-পবিত্রতম চরিত্রে কোন কালিমা লেপনের সুযোগ নেই। তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বলতে চাইলে নিশ্চিত হয়ে স্রেফ সত্যটুকুই বলতে হবে। তাঁর সম্পর্কে কোন সন্দেহযুক্ত কথাও বলাও ইসলামে নিষেধ।

বনু কুরাইযা গোত্রের বিখ্যাত কবি ও নেতা কা'ব ইবনু আশরাফ নানাভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কষ্ট দিত। একদা নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে কাবকে হত্যা কারতে পারবে? তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাকে হত্যা করতে গিয়ে কৌশল অবলম্বনের জন্য প্রতারণা করার সুযোগ চাইলে তাকে সে সুযোগও দেয়া হয়। ফলে তিনি কা'বকে হত্যা করেন *(ছহীহ বুখারী হা/৪০৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/১৮০১)*। একইভাবে আরেকজন ইহুদী নেতা আবু রাফিঈ' নবী করীম (ছাঃ)-কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তাকে হত্যা করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন আতীক-এর নেতৃত্বে কয়েকজন লোক প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন আতীক রাতের আঁধার তাকে হত্যা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তার নিহত হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেন *(ছহীহ বুখারী হা/৪০৩৯)*। প্রিয় পাঠক! এ হাদীছেও ফুটে উঠেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কষ্টদানকারী বা তার বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। প্রয়োজনে তাকে গুপ্ত হত্যা করাও যাবে। তাবে এ বিধান কার্যকার করতে হবে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে। রাষ্ট্রীয় ফরমান অনুযায়ী এক বা একাধিক ব্যক্তি মিলে এরূপ ব্যক্তিকে দিবা-নিশির যে কোন সময় যেভাবে সুবিধা তার হত্যা নিশ্চিত করবে।

আবু মুসা (রাঃ) বলেন, যখন মা'আয তার কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাকে বসার জন্য অনুরোধ করেন এবং তার জন্য একটি বালিশ রেখে দেন। এ সময় মা'আয (রাঃ) তাঁর নিকট বন্ধনযুক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এ ব্যক্তি কে? তখন আবু মুসা (রাঃ) বলেন, এই ব্যক্তি আগে ইহুদী ছিল, পরে ইসলাম কবুল করে, এর পার সে ঐ অভিশপ্ত (ইহুদী) ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন মা'আয (রাঃ) বলেন, আমি ততক্ষণ বসব না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তিকে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হয়। তখন আবু মুসা (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, এরূপই হবে। আপনি বসুন। তখন মা'আয (রাঃ) তিন বার এরূপ বললেন, আমি ততক্ষণ বসব না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তিকে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হয়। এর পর আবু মুসা (রাঃ) হত্যার নির্দেশ দেন এবং তা কার্যকর করা হয়। পরে তারা রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তখন তাঁদের একজন, সম্ভবত : মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাতে ঘুমাই ও উঠে ছালাতও আদায় করি; অথবা আমি রাতে উঠে ছালাত আদায় করি এবং ঘুমাইও। আর আমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করার জন্য যেরূপ ছওয়াবের আশা করি, ঐরূপ ছওয়াব আমি ঘুমিয়ে থাকাবস্থায়ও আশা করি *(আবুদাউদ হা/৪৩৫৪, সনদ ছহীহ)*।

সম্মানিত পাঠক! অত্র হাদীছেও বুঝা যাচ্ছে যে, ধর্মত্যাগী তথা মুরতাদদের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। যা রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর করা হবে। যদি রাষ্ট্রের সরকার তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে বিলম্ব করে তাহলে মুসলিম জনগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে। যেমনটি মু'আয (রাঃ) রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিয়েজিত আবু মুসা (রাঃ)-কে তড়িৎ জনৈক মুরতাদ-এর হত্যার বিধান কার্যকর ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কটূক্তিকারীদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সম্পর্কে 'ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক'-এর ফৎওয়া নিম্নরূপ :

সে ধর্মত্যাগী কাফের হিসাবে গণ্য হবে *(তাওবাহ ৬৫-৬৬)*। ছাহাবীগণসহ সর্বযুগের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ঐ ব্যক্তি কাফের, মুরতাদ এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব *(ইবনু তাইমিয়াহ, আছ-ছারেমুল মাসলূল ২/১৩-১৬)*। তবে তা প্রমাণ সাপেক্ষে আদালতের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের *(কারতুবী)*। এ দায়িত্ব পালন না করলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে। ঐ ব্যক্তি তওবা করলে তার তওবা কবুল হবে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে। এটাই হল বিদ্বানগণের সর্বাগ্রগণ্য মত *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৬/৫৩)*। রাসূল (ছাঃ)-কে গালিদাতা জনৈক ইহুদীকে জনৈক মুসলিম শ্বাসরোধ করে হত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার রক্তমূল্য বাতিল কর দেন *(আবূ দাউদ হা/৪৩৬১, ৪৩৬৩, নাসাঈ হা/৪০৭৬); বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০১৩, প্রশ্ন নং ৩১/২৭১, পৃঃ ৫৪।*

সমাপনী : সুধী পাঠক! এ বিশ্ব চরাচরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মত আরেকজন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করতে যতগুলো গুণ অর্জন করা প্রয়োজন সবগুলোই তাঁর চরিত্রে সমাহার ঘটেছিল। তাঁর চরিত্রের নির্মলতা সর্বজনবিদিত। অথচ তাঁকে নিয়েও মানুষ কুৎসা রটনা করলে তখন লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি অতীতের জাহেলী যুগের বর্বর অসভ্য মানুষগুলো তাঁকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিয়েছে। তথাপিও তাদের অপবাদের মধ্যে শালীনতাবোধ বিবর্জিত হয়নি। আর বর্তমান যুগের কথিত মুসলিম নামধারী নাস্তিকরা যে ভাব ও ভাষায় অপবাদ দিচ্ছে, তাতে শালীনতা তো দূরে থাক, অতি পাশবিক পাশুবের নৃশংসতাকেও হার মানাবে। তাঁর একান্ত ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করতেও এদের বিবেকে বাধে না ও অন্তর প্রকম্পিত হয় না। এ বিষয়ে তারা জাহেলী যুগের চেয়ে বহু ধাপ এগিয়ে। আবার এরাই হল সভ্যতার ধারক ও বাহক! সুশীল সমাজের প্রগতিশীল একজন বিবেকবান মানুষ (?) তনুমনে ভাবলে সে যুগ আর এযুগের মানুষের মাঝে কি কোন পার্থক্য পাবে? এটাই এখন ভাবনার বিষয়। এভাবে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি দুশ্চরিত্রের কিছু ব্যক্তি সৎ মানুষদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। আর সবলরা দুর্বলদের উপর চালিয়েছে বহুবিধ নির্যাতন ও অত্যাচার। কিন্তু আজ নির্যাতনকারী ঐসব নোংরা চরিত্রের মানুষগুলো সর্বমহলে ধিকৃত, নিন্দিত। আর মুখবুঁজে নিরবে যাঁরা নির্যাতন সহ্য করে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন তারাই স্মরণীয়, বরণীয় ও নন্দিত। তাঁদের নামে মানুষ শ্রদ্ধাভরে মনখুলে কল্যাণ কামনায় আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালি বা ইসলামের অবমাননা করে কেউ সফলতা পাবে না। ইহ-পর জগতে তাকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হবে। আল্লাহ আমাদেকে রক্ষা করুন। আর ঐ নাস্তিকদের হেদায়াত করুন নতুবা ধ্বংস করে দিন। আমীন!

লেখক : কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রসঙ্গ : তাবলীগী ইজতেমা : একটি সংস্কারধর্মী গণআন্দোলন

-বযলুর রহমান

ভূমিকা

নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ্র নির্দেশনার প্রচার-প্রসার এবং তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের নিকটে নিজেদেরকে এক অবিস্মরণীয় মডেল হিসাবে উপস্থাপন করেন। উপস্থিত হন এক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী যুগ সংস্কারক হিসাবে। যার আলোড়নে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্যাতিত মানবতা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হয়। বিশ্ব ইতিহাস যার জ্বাজল্য প্রমাণ। মূলত প্রচারের মাধ্যমে সংশোধন ও সংস্কারের পথের উপরই নির্মিত হয় ইসলামের চির শাশ্বত সোনালী সৌধ। যে সৌধ মটকাবে কিন্তু ভাঙ্গবে না। বস্তুতঃ দাওয়াত ও তাবলীগের মৌলিকত্ব ও চিরন্তনতা এখানেই নিহিত। নিম্নে বাংলাদেশের বুকে ১৯৯১ সাল থেকে অদ্যবধি চলমান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আয়োজিত বার্ষিক জাতীয় তাবলীগী ইজতেমা সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা এবং একটি সংস্কারধর্মী গণআন্দোলনের প্রতিরূপ হিসাবে এর মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হল।

ফিরে দেখা

১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। শিরক ও বিদ'আতের আতঙ্ক, বাতিলের খড়্গ, হক ও ন্যায়ের অতন্দ্রপ্রহরী নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এক নতুন দিনের সোনালী স্বপ্নের হাতছানি দিয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজের নিকটে নির্ভেজাল তাওহীদের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে যাবতীয় শিরক, বিদ'আত ও তাক্বলীদী ফির্কাবন্দীর অর্গল থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খালেছ মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের জীবন ও পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পরপরই দুই বছরের মাথায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঘুমন্ত দাওয়াতকে বিশ্ব মানবতার নিকটে পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের নিকট ইসলামের নির্ভেজাল বক্তব্য উপস্থাপনের মহা পরিকল্পনা নিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে **'ঐতিহাসিক ১ম জাতীয় সম্মেলন'**-এর পদযাত্রা শুরু হয়। ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল। আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। এদিন থেকেই আহলেহাদীছ যুবসংঘের স্বচ্ছ দাওয়াত জাতীয় সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের বিস্তৃত ময়দানে পদযাত্রার সূচনা করে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।* সেদিন আহলেহাদীছ যুবসংঘের ইতিহাসে এমনকি খোদ বাংলাদেশের ইতিহাসে হয়তবা সর্বপ্রথম 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যা উপস্থিত সুধী মণ্ডলী কর্তৃক উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করার প্রস্তাব আসে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল-খত্বীব প্রমুখ। সেদিন এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে দেশের নানা প্রান্ত থেকে তরুণ ও যুবকরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। সত্যের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মিছিলে এই অভূতপূর্ব আবেগ-অনুভূতির উচ্ছ্বাস যেন সুস্পষ্টভাবেই এ দেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের এক নবজোয়ারের আগমনীবার্তা অনুরণিত করেছিল *(মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ-২০১২, ১৫তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪১)*। অতঃপর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক সংঘাত ও আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের কারণে 'জাতীয় সম্মেলন'-এর ধারাবাহিকতায় পড়ে যায় এগার বছরের এক দীর্ঘ বিরতি। তারপর উক্ত ঘাত-প্রতিঘাত, ঝড়-ঝঞ্ঝাকে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে পুনরায় ১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬ শে এপ্রিল দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা। রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ) যে নওদাপাড়ার মাটিতে এক ঐতিহাসিক সমাবেশ করেছিলেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর দক্ষিণ পার্শ্বের বিস্তীর্ণ খোলা ময়দানে এই জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশের সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এই রাজশাহীতে তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।*

বাঁধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সত্যের আত্মপ্রকাশ

তাবলীগী ইজতেমার উক্ত ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত হয় ২০০৫ সালে। তৎকালীন ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী তথাকথিত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের কোপানলে পড়ে যায় সত্যান্বেষী ও জান্নাত পাগল হাজার হাজার মানুষের হৃদপিণ্ড সদৃশ এই 'তাবলীগী ইজতেমা'। জঙ্গীবাদের মিথ্যা ধোঁয়া তুলে ইজতেমার মাত্র দুদিন পূর্বে ২২ শে ফেব্রুয়ারীর গভীর রাতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় 'দারুল ইমারত আহলেহাদীছ' থেকে অকস্মাৎ বিনা ওয়ারেন্টে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয় তাবলীগী ইজতেমার মাননীয় সভাপতি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**সহ শীর্ষ চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে। পণ্ড করে দেয়া হয় তাবলীগী ইজতেমার সুদৃশ্য বিশাল প্যান্ডেল। জনমনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সশস্ত্র অবস্থান গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের চতুর্দিকে। সৃষ্টি হয় এক ভুতুড়ে পরিবেশের। এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতিতেও দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সত্যের তেজোদীপ্ত শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে অসংখ্য মানুষ ইজতেমা ময়দানে হাজির হন এবং ইজতেমা না হওয়ার

বেদনায় ব্যথাতুর মনে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিন নির্বিকার হয়ে গিয়েছিল মানুষের চিন্তা-চেতনা। স্তব্ধ হয়েছিল বাকশক্তি। দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে মানুষগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু থেমে থাকেনি তারা। বেঈমানী করেনি তাদের ঈমানী খুন। রীতিমত আন্দোলন ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করে সর্বোপরি আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে দীর্ঘ তিন বছর ছয় মাস ছয়দিন কারাভোগের পর ২০০৮ সালের ২৮ আগষ্ট মুহতারাম আমীর কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন *(ফালিল্লাহিল হাম্‌দ)*। অতঃপর আজ অবধি তাবলীগী ইজতেমা সফল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।*

সমাজ সংস্কারের কতিপয় দৃষ্টান্ত

প্রতিবছরের ফেব্রুয়ারী মাসটি সংগঠনের জন্য একটি বিশেষ মাস। রাজশাহীর ইজতেমায় আগমন করে হক্বপন্থী আপোষহীন আলেমদের নিকট থেকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা পাওয়ার জন্য হক্বপিয়াসী মানুষের উচ্ছ্বসিত মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠে। জান্নাত পাওয়ার আশায় যাবতীয় কষ্টকে তারা হাসিমুখে ধৈর্যের সাথে বরণ করে নেন।

কিন্তু কেন এই ব্যাকুলতা, কেন এই ব্যাগ্রতা? এর কারণ এদেশের মুসলিম সমাজে যে সংস্কারের পদধ্বনি দিনে দিনে উচ্চকিত হচ্ছে, বিগত ২২ বছর ধরে চলমান এই তাবলীগী ইজতেমা তারই সুযোগ্য প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে প্রতিনিয়ত। শিরক ও বিদ'আত থেকে সতর্ক হওয়া, যঈফ ও জাল হাদীছের উপর আমল না করা, যত বড় পীর-বুযুর্গই হোক না কেন, কোন মানুষকে অন্ধ অনুসরণ না করার চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে এই তাবলীগী ইজতেমা এ দেশের ঘুণে ধরা মুসলিম সমাজে যে ঈমানী চেতনার ঢেউ জাগিয়ে তুলেছে, তা সত্যিই আমাদেরকে আবেগাক্রান্ত করে তোলে এবং মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতার অশ্রুপাত নির্গত করায়। নিম্নে তাবলীগী ইজতেমার কতিপয় সমাজ সংস্কারের দিক আলোচনা করা হ'ল।

(ক) ভ্রান্ত আক্বীদার বিপরীতে বিশুদ্ধ আক্বীদার শিক্ষা : এক সময় এ দেশের মুসলিম সমাজ ছিল একচেটিয়াভাবে ভ্রান্ত আক্বীদায় ভরপুর। আল্লাহ নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, রাসূল নূরের তৈরী, রাসূল গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানেন- ইত্যাকার অসংখ্য সামাজিক কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে আচ্ছন্ন ছিল মুসলিম সমাজ। এমনকি আহলেহাদীছ নামধারীদের মধ্যেও এরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই তাবলীগী ইজতেমা মানুষের ঘুমন্ত চেতনাকে অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস অহীর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বানে জাগ্রত করেছে এবং সমাজের ভ্রান্ত আক্বীদা ও সামাজিক কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত হেনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত এবং সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতি জনগণের সম্মুখে উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছে।

(খ) বিশুদ্ধ প্রমাণ নির্ভর আমলে অভ্যস্তকরণ : বিশুদ্ধ দলীল নির্ভর আমল ইবাদত কবুলের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। কিন্তু বাংলার মুসলিম জনসাধারণ ইসলাম প্রতিপালনের জন্য বিশুদ্ধ দলীলের তোয়াক্কা করত না। মাযহাবী ফের্কাবন্দীর আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল মুসলমানদের ঈমানী চেতনা। অধিকাংশ আমল ছিল মাযহাবী ইমামের অন্ধভক্তি এবং যঈফ ও জাল হাদীছ নির্ভর। সুতরাং মানুষ যাতে করে বিশুদ্ধ প্রমাণ নির্ভর আমলী যিন্দেগী পরিচালনা করতে পারে সেই জন্য তাবলীগী ইজতেমা সর্বসাধারণ মানুষের নিকট অত্যন্ত জোরালোভাবে আহ্বান করে থাকে। যার ফলে সমাজের একজন নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এখন মিথ্যা ও দুর্বল হাদীছের পরিবর্তে ছহীহ দলীলের অনুসন্ধান করে *(ফালিল্লা-হিল হামদ)*।

(গ) মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদ সমূহকে পরিহারের আহ্বান : মানুষ তার জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করছে। ফলে বস্তুবাদিতা ও পরকালবিমুখতা মানুষকে হিংস্র পশুতে পরিণত করেছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি মস্তিস্কপ্রসূত মতবাদ সমূহ মুসলিম জনসাধারণকে ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে বের করে দুনিয়া সর্বস্ব মানুষের গোলামীতে আবদ্ধ করেছে। ফলে বিশ্ব আজ অশান্তির অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়েছে। অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে বিশ্বব্যাপী। তাবলীগী ইজতেমা তাই বিশ্বের মানুষের নিকটে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করে এর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বলে, 'সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর'। সাথে সাথে দৃপ্তভাবে ঘোষণা করে, 'আমরা চাই এমন

একটি সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ, থাকবে না ইসলামের নামে কোন মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ'।

(ঘ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়া : অখণ্ড মুসলিম মিল্লাত আজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেছে। বিভিন্ন মাযহাব, মতবাদ, ইযম, মারিফতী ফন্দী ও তরীকার বেড়াজালে মানুষ আজ শতধা বিভক্ত। মুসলমান আজ নিজেদের মধ্যে মতের সাদৃশ্য না হওয়ায় সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে। নিজের পিতা, ভাই ও বোনকে পরিবারচ্যুত এমনকি সমাজচ্যুত করতে দেখা যায় মতের অমিলের কারণে। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে তাবলীগী ইজতেমা মানুষকে যাবতীয় মাযহাব, মতবাদ, ইযম ও তরীকার বেড়াজাল ছিন্ন করে অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত ও একমাত্র মানদণ্ড পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হয়ে বিশুদ্ধ জীবনবিধানের প্রতি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে থাকে। এ লক্ষ্যে তাবলীগী ইজতেমার সহজ-সরল অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আহ্বান-'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'।

(ঙ) পরকালমুখী হওয়া : তাবলীগী ইজতেমার অন্যতম দিক হল এখানে কোন আলোচক বা বক্তাগণ অন্য কোন দল বা মতের প্রতি আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে। এমন কোন বাক্য ব্যবহার করা হয় না যাতে অন্য দল বা সংগঠনের সদস্য বা মানুষকে কষ্ট বা দুঃখ দেয়। বরং মানুষকে সর্বদা দুনিয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে পরকালমুখী করার উদাত্ত আহ্বান করে থাকে। আর এখানেই নওদাপাড়ার তাবলীগী ইজতেমার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

(চ) একক ইমারতের অধীনে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা : জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন মুসলিম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এককভাবে জীবন-যাপন বৃক্ষ-লতাহীন মরুভূমির ন্যায়। জামা'আত ছাড়া বসবাস করা জাহিলিয়াতের হালাতে মৃত্যুর সাথে তুলনীয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জামা'আত থেকে পৃথক থাকল, সে যদি মৃত্যুবরণ করে তা'হলে জাহিলিয়াতের হালাতে মৃত্যুবরণ করবে' *(ছহীহ বুখারী হা/৭০৫৪; ছহীহ মুসলিম হা/৪৮৯২; মিশকাত হা/৩৬৬৮, 'নেতৃত্ব ও বিচার ফায়সালা' অধ্যায়,*

অনুচ্ছেদ-১)। সুতরাং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র তাবলীগী ইজতেমা বিশ্ব মানবতাকে একক নির্ভেজাল তাওহীদ ও রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকারকারী একক ইমারতের অধীনে সার্বিক জীবন পরিচালনা করার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করে।

(ছ) শিরক ও বিদ'আতমুক্ত জীবন গঠন : শিরকের শিখণ্ডী আর বিদ'আতের বেসাতী চূর্ণ-বিচূর্ণ ও উৎখাতের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব আজ

শিরক ও বিদ'আতের নোংরা নর্দমায় নিমজ্জিত। ভুলে গেছে মুসলিম ঐতিহ্য আর রাসূলের বিশ্বজয়ী আদর্শের বিশ্বময়তার বিস্ময়তা। তাই নির্ভেজাল তাওহীদের বিলুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ আদর্শকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই তাবলীগী ইজতেমা এক বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে।

অন্যান্য তাবলীগী ইজতেমা আর নওদাপাড়ায় আহলেহাদীছের তাবলীগী ইজতেমার মধ্যে কতিপয় পার্থক্য :

দেশে প্রচলিত স্বপ্নে প্রাপ্ত মতবাদ ও শিরক-বিদ'আতের আখড়া ইলিয়াসী জামা'আতের তাবলীগী ইজতেমা প্রতিবছর ঢাকায় টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে লাখো মুসলিম জনসাধারণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে আল্লাহ প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠিত হয় উত্তরবঙ্গে রাজশাহীর নওদাপাড়ার ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে আহলেহাদীছের সুবৃহৎ দুদিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমা। আক্বীদাগত বিশ্বাস, আমলগত বৈশিষ্ট্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ-পরিক্রমণের দিকে লক্ষ্য করলে উভয় ইজতেমার মধ্যে দেখা যায় বিস্তর ব্যবধান। যেমন-

(ক) টঙ্গীর ইজতেমায় উক্ত জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়ের কপল-কল্পিত কেচ্ছা-কাহিনী এবং যঈফ ও জাল হাদীছ ভিত্তিক আমলের প্রতি আহ্বান করা হয়। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছের তাবলীগী ইজতেমায় কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার প্রতি আহ্বান করা হয়।

(খ) টঙ্গীর ইজতেমায় মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা, চিল্লা প্রথা আর আক্বীদাগত বিভ্রান্তি চরমভাবে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছের তাবলীগী ইজতেমা এগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মানুষকে সঠিক দ্বীনের অনুসারী করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

(ঘ) শৈথিল্যবাদ ও বৈরাগ্যবাদ তবলীগ জামাতের ইজতেমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কারণ দল-মত নির্বিশেষে সর্বশ্রেনীর মানুষ তাদের তথাকথিত আখেরী মোনাজাতে অংশগ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছের তাবলীগী ইজতেমা ইসলামের মূল ও আদিরূপ প্রতিষ্ঠায় মুসলিম জনসাধারণকে একক ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান করে। যাবতীয় ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ও অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে আপোষহীনভাবে হক্বের উপর অটুট থাকে। কখনো অস্তিত্বের দোহাই দিয়ে বাতিলের সাথে আপোষ করে না। সর্বদা আল্লাহ্র পবিত্র অহীকে অগ্রগণ্য করে থাকে।

(ঙ) টঙ্গীর ইজতেমায় শুধুমাত্র ফাযায়েলে নিসাবের কিতাব সমূহ থেকে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। যা অধিকাংশ মিথ্যা বানোয়ট ও যঈফ হাদীছ ভিত্তিক বক্তব্য। সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রস্তাবনা কিংবা আবেদন পরিলক্ষিত হয় না। বাতিলের প্রতি সংগ্রামের কোন নজীরই তাদের বক্তব্য-বিবৃতিতে প্রতিফলিত হয় না। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছের ইজতেমায় সর্বদা সমকালীন সমস্যাসমূহের উপর তত্ত্ব ও তথ্যবহুল অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির নামে যাবতীয় উদ্ভূত সমস্যার বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, তেমনি সরলমনা মুসলিম জনসাধারণের ঈমানের সুযোগ নিয়ে যারা বিজাতীয় সভ্যতার দিকে মানুষকে আহ্বান করে তাদের বিরুদ্ধেও গণআন্দোলন গড়ে তুলে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুচিন্তিত ও যুগোপযোগী প্রস্তাবনা পেশ করে থাকে।

পরিশেষে বলব, হে মুসলিম জাতি! তোমার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তুমি আজ বিজাতীয় সভ্যতার ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। তুমি আজ ঘরে-বাইরে পাশ্চাত্য মতবাদের হিংস্র ছোবলের অসহায় শিকার। তোমার চেতনা আজ স্তব্ধ ও কর্মহীন জড় পদার্থে পর্যবসিত। তুমি আজ নামেমাত্র মুসলিম হয়ে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের গোলামে পরিণত হয়েছো। অতএব হে তরুণ নওজোয়ান ও ছাত্র সমাজ! তোমার বিশ্বজয়ী গৌরবান্বিত সোনালী ইতিহাস ও ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও তুমি আজ কেন বিজাতীয় সভ্যতার খোরাকে পরিণত হয়েছো? তুমি কেন শিরকের শিখণ্ডী আর বিদ'আতীদের লালনকারীদের অপরাধকর্মে শরীক হয়েছ? তুমি না মুসলিম? তোমার শরীরে মুছ'আব বিন উমায়ের, খালিদ বিন ওয়ালিদ, বেলাল, তারিক বিন যিয়াদ, মূসা বিন নুসাইর, মুহাম্মাদ কাসিম-এর তেজোদীপ্ত খুন প্রবাহিত হচ্ছে! যাদের সিংহ গর্জনে বাতিল শক্তি পর্যদুস্ত হয়েছে, অবদমিত হয়েছে বিজাতীয় সভ্যতার হিংস্র থাবা, উৎখাত হয়েছে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত। তাইতো দুনিয়া কাপানো শ্লোগান 'সকল বিধান বাতিল কর অহীর বিধান কায়েম কর' ও 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি' তাবলীগী ইজতেমায় লক্ষ জনতার উদ্দেপিত কণ্ঠে পুনঃপুনঃ অনুরণিত হয়। তারপর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে তরতাজা ঈমানের দৃপ্ত মশাল হাতে নিয়ে পুণরায় স্ব স্ব গন্তব্যে ফিরে যায়। এভাবে সমাজ-সংস্কারের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে দিক-দিগন্তে, শহরে-বন্দরে। কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল এভাবেই হক্বের দাওয়াত প্রচার করেই যাবে। বাতিলের কোন শক্তি নেই তাদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করার। এটাই আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই তাবলীগী ইজতেমাকে কবুল করে নিন এবং সারাদেশের মানুষের জন্য একে বিশুদ্ধতম হেদায়েতের বার্তাবাহক বানিয়ে দিন। আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি]

শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

মুখবন্ধ :

মহান আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নে'আমতরাজির মধ্যে অন্যতম নে'আমত আমাদের অতি আদরের প্রাণপ্রিয় সোনামণি তথা শিশু-কিশোররা। বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের সকল জাতি, সমাজ ও দেশের একমাত্র ও মৌলিক সমস্যা হচ্ছে শিশু-কিশোর এবং যুবকদের চারিত্রিক অবক্ষয়। মুসলিম জাতি আজ গতানুগতিকতা, আদর্শহীনতা, পাশ্চাত্যের অন্ধঅনুকরণ ও অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে। তারই মধ্যে উজানের প্রবল স্রোত বেয়ে ছিন্ন পাতায় সাজানো তরণীর মত হাঁটি হাঁটি পা-পা করে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার দৃপ্ত শপথ নিয়ে নিজেদের পরিচিতি, জীবনাদর্শ, আক্বীদা-আমল ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার সফরে নেমেছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'। আজকের সোনামণি আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। সোনামণিরাই হবে অনাগত দিনে দেশের আমীর, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সচিব, ডিসি, ভিসি, ইমাম, মুফতী, আলেম, হাফেয, ক্বারী ইত্যাদি দেশ পরিচালনায় সকল দিক ও বিভাগের কর্ণধার। তাদের চারিত্রিক অবক্ষয় হলে দেশ ও জাতি ডুবে যাবে অধঃপতনের অতল তলে। সমাজে নেমে আসবে চরম অশান্তি ও অনাচার। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে দুর্নীতির বহ্নিশিখা। আদর্শ ও চরিত্রহীন সোনামণি হালবিহীন নৌকার মত। তাই শিশু-কিশোরদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার জন্যই সোনামণি সংগঠনের মাধ্যমে ৫৬,০০০ বর্গমাইলের বাংলাদেশের প্রায় ৮ কোটি সোনামণিদের মেধা ও মননের পরিবর্তন ঘটাতে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ

সোনামণিদের নৈতিক অবক্ষয়ের অনেকগুলো কারণের মধ্যে এখানে নিম্নবর্ণিত ১৫টি কারণকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন- ১. সুশিক্ষার অভাব। ২. পিতা-মাতা সচেতনতার সাথে যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন না করা। ৩. শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের প্রকৃত শিক্ষাদানে উদাসীন মনোভাব। ৪. শিশু-কিশোর সংগঠকদের দায়িত্বপালনে উদাসীনতা। ৫. পাশ্চাত্য ও অন্যান্য দেশের অনৈসলামিক আদর্শের বাহুল্যতা ও সহজলভ্যতা। ৬. সমাজ-সেবামূলক কাজে শিশু-কিশোরদের উদ্বুদ্ধ না করা। ৭. বালক-বালিকাদের সহ-শিক্ষার কুফল। ৮. আলেম-ওলামাদের কর্মবিমুখতা। ৯. পারিবারিক ও সাংগঠনিক পর্যায়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক না হওয়া। ১০. নেশাজাতীয় দ্রব্যের সহজপ্রাপ্যতা। ১১. অসৎ ও চরিত্রহীন বন্ধুদের সাহচর্য। ১২. বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ী ঘন ঘন বেড়ানো ও অবস্থান করা। ১৩. কল্পনাপ্রবণ ও স্বপ্নাশ্রয়ী শিশু-কিশোরদের যথাযথ মনের খোরাক না দেওয়া। ১৪. ইসলাম অনুসারীদের নিজ ও পরিবারের সৌন্দর্য, চেতনা ও রুচিশীলতার অভাব। ১৫. ওলামা-মাশায়েখ ও ধর্মীয় শিক্ষকগণের আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সুস্থ সংস্কৃতি ও সঠিক ইসলামী আক্বীদা বিমুখতা।

শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিকার

১. শিশু-কিশোরদের সুশিক্ষা প্রদানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ :

মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে আপন হাতে নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন *(ছোয়াদ ৭৫)*। তিনি চান তাঁর সুন্দরতম সৃষ্টি সুন্দরভাবে জীবনযাপন করুক। এ লক্ষ্যে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সুন্দর জীবন যাপনের সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন ।

বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত ও একমাত্র উৎস স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ 'সকল জ্ঞানের উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলা' *(আহক্বাফ ২৩)*। তিনি বলেন, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 'আর আল্লাহ্‌র জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে' *(তালাক্ব ১২)*। সোনামণিদের জন্য প্রকৃত সুশিক্ষা নিশ্চিত করার এ মহান দায়িত্ব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংগঠনিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার তেমন কোন সমন্বয় নেই। তাই এ ব্যাপারে প্রকৃত দায়িত্ব পালন করতে হবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাংগঠনিকভাবে। ইসলামে জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বৃহদাংশ জুড়ে জ্ঞানার্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্‌র বাণী, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ– 'পড়! তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। 'যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে'। পড়! তোমার রবের নামে যিনি মহা সম্মানিত'। 'যিনি ক্বলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন'। 'মানুষ যা জানত না সেগুলোকে শিক্ষা দিয়েছেন' *(আলাক্ব ১-৫)*। তিনি আরো বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا 'আর তিনি আদমকে যাবতীয় জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন' *(বাক্বারাহ ৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮)*। তিনি আরও বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ 'আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা তেমন যেমন তোমাদের নিম্নতমের উপর আমার মর্যাদা' *(তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১২-২১৪)*। তিনি অন্যত্রে বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يلتمس فِيهِ عِلْمًا سَهل اللَّهُ له به طَرِيقًا الِي الْجَنَّة 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২)*। জ্ঞানার্জন সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তিনি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন' *(ছহীহ বুখারী হা/১৭; ছহীহ মুসলিম হা/২৪৩৬; মিশকাত হা/২০০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ 'অজ্ঞ ইবাদতকারীর তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা পূর্ণিমা রাতের শশী (চাঁদ) যেমন তারকারাজির উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৪৩; মিশকাত হা/২১২)*। Stanly Hall ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, "If you teach their the three `R`s, Reading, writing and Arithmetic and don`t teach the fourth `R` Religion, they are Sure to become fifth `R` Rascal". 'যদি তুমি তাদেরকে (সোনামণিদেরকে) তিনটি 'আর' তথা পড়া, লেখা ও গণিত শিক্ষা দাও এবং চতুর্থ আর তথা ধর্ম শিক্ষা না দাও, তাহলে অবশ্যই তারা পঞ্চম আর তথা বেয়াদব হবে'। সুতরাং আমাদের উচিৎ ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে এবং দেশ ও জাতির

বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সোনামণিদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সঠিক আক্বীদায় সুশিক্ষা প্রদান করা কর্তব্য।

২. পিতা-মাতাকে সচেতনতার সাথে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা :

পিতা-মাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে সন্তান-সন্ততিকে বৈষয়িক শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রকৃত আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা। এ জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ্র বাণী, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬)*। নিজ পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সঠিক পদ্ধতিতে ছালাতের প্রশিক্ষণ দেওয়া পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ বরেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'তুমি তোমার পরিবারবর্গকে ছালাতের আদেশ দাও এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকো' *(ত্বহা ১৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ 'তোমাদের সন্তানরা যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হবে তখন তাদেরকে ছালাতের আদেশ দাও এবং যখন তারা ১০ বছর বয়সে পৌঁছবে তখন ছালাতের জন্য প্রহার কর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২। সনদ হাসান)*। রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র আরও বলেন, 'তুমি তোমার পরিবারের জন্য উপার্জিত সম্পদ হ'তে সামর্থানুসারে ব্যয় কর। পরিবার-পরিজনকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যাপারে শাসন থেকে বিরত থেকো না। আর মহান আল্লাহ্র ব্যাপারে পরিবারের সদস্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন কর' *(আহমাদ হা/২২১২৮; আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মিশকাত হা/৬, হাদীছ হাসান)*। অতএব পিতা-মাতার দায়িত্ব হল তাদের আদরের সন্তানদেরকে শুধু রাগ, মারপিট আর ধমক না দিয়ে আদর করে ভালো ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ শিক্ষা দেওয়া। প্রতিটি কাজে ইসলামী তথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ যেমন ছালাত, ছিয়াম, খাওয়া, পানাহার, পোশাক পরা, চলাফেরা, ঘুমান, পায়খানা-পেশাব ইত্যাদিতে যথাযথ উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট প্রাণখোলা দো'আ করা।

৩. শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষাদানে যথাযথ ভূমিকা পালন করা :

শিক্ষকদেরকে মানুষ গড়ার এবং জাতি গড়ার কারিগর বলা হয়। আমাদের সকলকে স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে' *(ছহীহ বুখারী হা/৮৯৩; ছহীহ মুসলিম হা/৪৮২৮; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। একজন আদর্শ শিক্ষক দেশ ও জাতিকে সুউচ্চ আসনে পৌঁছে দিতে পারে। তাই শিক্ষকদেরকে মুকুটহীন জ্ঞান বিতরণের সম্রাটও বলা হয়। প্রকৃত আদর্শবান শিক্ষকের কারণে তাঁর প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা হবে পোশাকে মার্জিত, আচার-ব্যবহারে বিনয়ী, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ। আমাদের মহানবী (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'আর অবশ্যই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী *(ক্বালাম ৪)*। সকল কাজ কর্মে আমাদের রাসূল (ছাঃ)-কে আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান শিক্ষকগণ তাদের সেই দায়িত্ব ভুলে গিয়ে কেউ কেউ ছুটছেন অর্থের পিছনে, কোচিং, ব্যাচ আর প্রাইভেট নিয়ে। আবার কেউ কেউ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অশালীন ও নির্লজ্জ আচরণ করছেন যার প্রমাণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাই এদেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, হে শিক্ষকমণ্ডলী! আপনাদের উপর অর্পিত জাতি গড়ার এ মহান দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট হউন। তাহলে মহান আল্লাহ আপনাদেরকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মঙ্গল দান করবেন।

৪. শিশু-কিশোর সংগঠনের দায়িত্বশীলদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা :

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। মহান আল্লাহ্র বাণী, الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য (ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন) *(কাহাফ ৪৬)*। বর্তমান পৃথিবীতে আদর্শ-নীতি, পথ ও মতের কোন শেষ নেই। বিরাজমান শিশু-কিশোর সংগঠনগুলোর অধিকাংশই বস্তুবাদী ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন দর্শন বা আদর্শের সনিষ্ঠ অনুসারী। সেখানে ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নের কোন দিক-নির্দেশনা অনুপস্থিত। অন্যদিকে প্রকৃতপক্ষে কার আদর্শে শিশু-কিশোরদের গড়তে হবে এ সম্পর্কে একমাত্র 'সোনামণি' সংগঠনই তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও নির্দেশনা জাতির কাছে তুলে ধরেছে। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে উত্তম নমুনা নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। প্রত্যেক শিশু-কিশোর সংগঠনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদেরকে নিম্নের গুণাবলী অর্জন সাপেক্ষে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। যেমন- ১. তাক্বওয়া অর্জন ২. সদাচারণ ও উদারতা ৩. ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ৪. স্বার্থ ও ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা ৫. ওয়াদা ও আমানত রক্ষা করা ৬. সকলের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ৭. টার্গেটভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন ও যোগাযোগের সমন্বয় করা।

শিশু ও বড়দের মাঝে আলোচনা ও দাওয়াতের পদ্ধতি হবে ভিন্ন। বড়দের যে পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া হয়, শিশুদের সে পদ্ধতিতে আয়ত্বে আনা সম্ভব নয়। সোনামণিদের আয়ত্বে আনার উপায় হবে ৫টি। যথা : ১. সালাম ও মুছাফাহা করা ২. বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা ৩. লেখা-পড়া ও পরিবারের খোঁজ নেয়া ৪. সম্ভাব্য সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা ও ৫. পরিবেশ বুঝে সাংগঠনিক দাওয়াত দেওয়া। উপরোক্ত পদ্ধতিতে সোনামণিদেরকে আয়ত্বে আনা সম্ভব। সুতরাং সকল প্রকার দায়িত্বশীলদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে, স্ব-স্ব এলাকার শিশু কিশোরদের সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রণয়ন করা এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক টার্গেটের ভিত্তিতে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা। আর এভাবেই তাদেরকে ছোট থেকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

৫. অনৈসলামিক আদর্শের সয়লাব রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা :

পাশ্চাত্যসহ অন্যান্য দেশের ধার করা আদর্শ গ্রহণ করে আমাদের সোনামণি ও যুবক-যুবতীরা চরিত্রহীন হচ্ছে। ডিশ, ইন্টারনেটের আকাশ-সংস্কৃতি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ইত্যাদি হচ্ছে যুব চরিত্র বিধ্বংসী অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। বাংলাদেশসহ সমস্ত পৃথিবীর প্রধান সমস্যা হচ্ছে শিশু-কিশোর তথা যুবকদের নৈতিক অবক্ষয়। আমাদের সন্তানেরা পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তায় ও আচার-আচরণে গ্রহণ করছে অনৈসলামিক আদর্শ। পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরুব্বী ও সংগঠনের দায়িত্বশীলবৃন্দ শিশু-কিশোরদের সঠিক শিক্ষা দিতে ও তাদের মনের খোরাক যোগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। যার মূলে রয়েছে সকল প্রকার দায়িত্বশীলদের ইসলামী আক্বীদা ও বিশুদ্ধ দিক নির্দেশনার অজ্ঞতা। তাই আসুন! আমরা সকলে মিলে আমাদের সন্তানদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা আদর্শ পরিহার করে দেশ, জাতি, সমাজ ও পরিবারকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করি।

৬. সমাজসেবামূলক কাজে সোনামণিদের উদ্বুদ্ধ করা :

সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত, অসহায় ও অত্যাচারিতদের পাশে যেভাবে অনৈসলামিক সংগঠনগুলোর দায়িত্বশীলগণ এগিয়ে আসে, সেভাবে এদেশের ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের তেমন জোরালো কোন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। অথচ এ বিষয়ে আল্লাহ

বলেন, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ‘সে তো এমন, যে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয় ইয়াতীমকে এবং উদ্বুদ্ধ করে না মিসকীনকে খাওয়াতে’ *(মা‘উন ২-৩)*। সুতরাং আমাদের শিশু-কিশোরদের মাঝে অসুস্থ রোগী, অসহায়, দুর্বলদের সার্বিক সহযোগিতা দানে এগিয়ে আসা, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করা, গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রাইভেট পড়ানো এবং ইসলামী প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিশেষ নমুনা স্থাপনের জাযবা তৈরী করতে হবে। অতএব আসুন! আমরা স্বার্থ-দ্বন্দ্বহীন ভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের আকাঙ্খায় এ ধরনের সমাজসেবামূলক কাজে আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা করি।

৭. বালক-বালিকাদের সহশিক্ষা নিষিদ্ধ করা একান্ত যরূরী :

সোনামণিদের ইসলামী আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার জন্য সহ-শিক্ষা নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সোনামণিদের চরিত্র গঠনের জন্য ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে অথবা শিফটিং ব্যবস্থা চালু থাকবে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার কারণে উভয়ের লজ্জা কমে যায়। একই সঙ্গে চা-নাস্তা করা, গল্প করা ও খেলাধূলার মাধ্যমে একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। বড় হলে পূর্ব পরিচিতির জের ধরে অবৈধ ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। এটাই বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র। আমাদের পারিবারিক ব্যবহার্য কাঠের আসবাবপত্র যেমন ঘুণে ধরে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি আমাদের অতি আদরের সোনামণিরা ধীরে ধীরে চারিত্রিক অবক্ষয়ে নিপতিত হয়। পরিবার, শিক্ষক, রাষ্ট্র ও সমাজের সকল দায়িত্বশীলের এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আদর্শ হচ্ছে এমন এক প্রহরী, যা মানুষকে সারাজীবন সৎপথে চলতে শেখায়। ছালাত-ছিয়ামের মত পর্দা করাও যে ফরয তা সোনামণিদের শিখাতে হবে। পর্দার সুফল সম্পর্কেও সোনামণি বালিকাদের শিখাতে হবে। যেমন– ১. পর্দা করা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ ২. রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ ও মর্যাদার প্রতীক, ৩. ধূলাবালি ও ময়লা থেকে রক্ষা করে, ৪. সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ৫. পিতা-মাতার আদর্শ সন্তান হিসাবে পরিচিতি বাড়ে, ৬. সুবুদ্ধির উদয় হয় ও মাথা ঠাণ্ডা থাকে, ৭. দ্বীনের কাজে আগ্রহ ও আন্ত রিকতা বৃদ্ধি পায়, ৮. মুমিনের ভাল লোকদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, ৯. মাস্তান ও দুশ্চরিত্রদের থেকে রক্ষাকবচ, অর্থাৎ Eve-teasing (উত্যক্ত) করা হবে না, ১০. জান্নাতের পথ সুগম হয় ইত্যাদি। গত ১.৪.১৩ তারিখ বিবিসি সংবাদ মাধ্যমে জানা যায় যে, ফিলিস্তীনের গাজায় ৯ বছর বয়স থেকে বালক ও বালিকাদের সহশিক্ষা নিষিদ্ধ করেছে। আমাদের দেশেও এরূপ ব্যবস্থা নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুবুদ্ধি দান করুন।

৮. আলেম-ওলামাদের কর্মবিমুখতা দূর করা :

সমাজে ও দেশে ওলামাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশী। তাঁরা সারাদিন ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে চায়ের স্টলে এবং তাবলীগের নামে অসংখ্য যুবক, কর্মঠ ও বয়স্ক মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে মসজিদে মসজিদে শুয়ে, বসে, ঘুমিয়ে এবং তাসবীহ টিপে ইসলামের নামে অনেক জাল-যঈফ হাদীছ, কল্প-কাহিনী ও গল্প শুনিয়ে দিন-রাত, সপ্তাহ মাস ও বছর চিল্লার নামে কাটিয়ে দিচ্ছে অলস জীবন। যা কখনও কাম্য নয়। এভাবে তারা কর্মবিমুখতা, মিশ্র ও বহুরূপ ধারণ করে। সুতরাং আমাদের দেশে আলেম-ওলামাদের উচিৎ এভাবে অলস জীবন না কাটিয়ে পরিবার, সমাজ ও দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে এগিয়ে আসা এবং ইসলামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

৯. নিয়মিত পারিবারিক ও সাংগঠনিক বৈঠকের ব্যবস্থা করা :

আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি পরিবারই মূল সংগঠন। তাই প্রত্যেকটি পরিবার ও সংগঠনের জন্য সাপ্তাহিক বৈঠক অপরিহার্য। আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ গড়ার ভিত্তি স্থাপিত হয় এই সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে। দেশের শিশু-কিশোর তথা যুবকদের চরম চারিত্রিক অবক্ষয় রোধে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান আহরণ করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ও উপায় হচ্ছে সাপ্তাহিক বৈঠক। জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত’ *(মুজাদালাহ ১১)*। জ্ঞানীদের মর্যাদা

সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'হে নবী আপনি বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে! কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৯)*।

আল্লাহ্র নিকট জ্ঞানী সম্প্রদায়ই সর্বাধিক মর্যাদাশীল ও সম্মানের অধিকারী। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَنْ عُثْمَانَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. উছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায় *(ছহীহ বুখারী হা/৫০২৭; আবুদঊদ হা/১৪৫২; মিশকাত হা/২১০৯)*। এই হাদীছের মর্মানুযায়ী দুনিয়ার সব শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হচ্ছে যার মধ্যে কুরআনের শিক্ষা আছে এবং সব ছাত্রের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হচ্ছে সে, যে কুরআনের জ্ঞানার্জন করেছে।

নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকের উপকারিতা : ১. সাংগঠনিক জীবনের হাতেখড়ি হয়, ২. জ্ঞানের প্রসার ও প্রখরতা বৃদ্ধি পায়, ৩. নেতৃত্ব সৃষ্টি করে, ৪. সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়, ৫. আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়, ৬. দাওয়াতী কাজে উৎসাহিত করে, ৭. দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি ও উপায় শিক্ষা দেয়, ৮. দারস ও বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দেয়, ৯. আমল সংশোধন করে, ১০. পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে, ১১. অতুলনীয় জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়, ১২. পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা সম্ভব হয়, ১৩. খোলামেলা আলোচনার অভ্যাস ও সাহস গড়ে উঠে, ১৪. সময়ের কাজ যথাসময় করার অথবা নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়, ১৫. সত্যিকারের দ্বীনের খাদেম ও মুজাহিদ হিসাবে গড়ে উঠা সম্ভব।

তাই আসুন! আমরা সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক অনুশীলন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ি। এ ক্ষেত্রে আমরা নিম্নের রুটিনটি অনুসরণ করতে পারি। যেমন প্রতি সপ্তাহে ১৬৮ ঘন্টা। এর মধ্যে মাত্র ১ ঘন্টা ইসলামী সংগঠনের কাজে ব্যয় করা, ৩৫ ঘন্টা বাড়ীতে পড়াশুনা করা, ৪৮ ঘন্টা স্কুল/মাদরাসায় ও প্রাইভেট পড়ে ব্যয় করা, ৮৪ ঘন্টা খাবার, ঘুম ও বিশ্রাম এবং খেলাধূলার জন্য ব্যয় করা (১+৩৫+৪৮+৮৪)= ১৬৮ ঘন্টা।

১০. নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ও সহজলভ্যতা দূর করা ঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'সকল প্রকার নেশাজাত দ্রব্যই মদ। আর সব ধরনের মদই হারাম *(ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৩৭, 'পানাহার অধ্যায়'-৩৭, অনুচ্ছেদ-৭)*। মদ হচ্ছে সকল অশ্লীল কর্মের মূল। মদ কোন বস্তুর নাম নয়। বরং মস্তিষ্ক বিকৃত করার এক শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আমাদের দেশে প্রচলিত তামাক, বিড়ি, সিগারেট, আফিম, গাজা, ভাং, হেরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য যে নামে চলুক না কেন তা মদ এবং তা সবই হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন- وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ 'যে ব্যক্তি সর্বদা নেশাজাত দ্রব্য পান করে এবং তাওবা না করে মারা যাবে। সে পরকালে সুস্বাদু পানীয় পান করতে পারবে না' *(ছহীহ মুসলিম হা৫৩৩৬; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ– 'আল্লাহ ওয়াদা করেছেন নেশাজাত দ্রব্য পানকারীদেরকে 'ত্বীনাতে খাবাল' পান করাবেন। জিজ্ঞাসা করা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ত্বীনাতুল খাবাল কি? উত্তরে তিনি বললেন, তা হচ্ছে জাহান্নামবাসীদের শরীর নিঃসৃত রক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৩৫; মিশকাত হা/৩৬৩৯)*। তিনি অন্যত্র আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ 'নেশায় বুদ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৭৮)*। রাসূল (ছাঃ) নেশাদ্রব্য পানকারীকে জুতা ও খুরমা গাছের ডাল দ্বারা ৪০ বার মারতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৩৬১৪)*। নেশাজাত দ্রব্য পানকারীদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন- ১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ২. সর্বদা জুয়া ও লটারীতে অংশগ্রহণকারী ৩. খোটাদানকারী ৪. ও সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না' *(দারেমী, মিশকাত হা/৩৬৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৩)*। অতএব আমাদের শিশু-কিশোর ও যুবকদের যাবতীয় নেশাজাত দ্রব্য থেকে দূরে রাখার

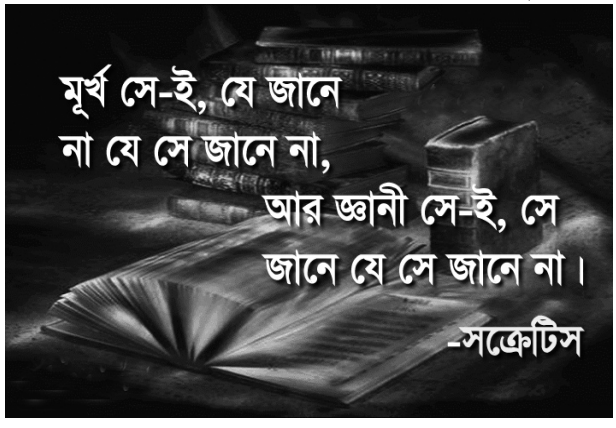

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. অসৎ ও চরিত্রহীন বন্ধুদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা :

মানব জীবন একাকী চলতে পারেনা। পৃথিবীতে চলতে গেলে বন্ধু, সাথী, সঙ্গী বা কল্যাণকামী অপরিহার্য। মহানবী (ছাঃ) নিজেও সর্বদা সঙ্গী-সাথী নিয়ে চলতেন। তাদেরকে তিনি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পেরেছিলেন বলেই তারা হয়েছিলেন সোনার মানুষ এবং গড়েছিলেন সোনালী সমাজ। সুতরাং বুঝা যায় বন্ধুদের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে সোনামণি তথা যুবক-যুবতীদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে বন্ধু নির্বাচনে ভুল করা। মহান আল্লাহ্র বাণী, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ 'মুমিনগণ যেন অন্য কোন মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে তাদের সাথে মহান আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না' *(আলে-ইমরান ২৮)*। তিনি আরও বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের সাথে থাক' *(তাওবা ১১৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ 'তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে! অথচ আল্লাহই তো তাদের একমাত্র অভিভাবক বা বন্ধু' *(শুরা ০৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 'সে ব্যক্তি তারই সাথে থাকবে, সে যাকে ভালবেসেছে *(তিরমিযী হা/২৩৮৫। হাদীছ ছহীহ।)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সৎ ও অসৎ সাহচর্য সম্পর্কে যথাক্রমে আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'আতর বিক্রেতা হয়তো এমনিতেই কিছু আতর দিবে অথবা তুমি কিছু ক্রয় করবে আর কিছু না হলেও আতরের সুগন্ধি পাবে। পক্ষান্তরে কর্মকার তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে আর কিছু না হলেও অন্ততঃ ধোঁয়ার দুর্গন্ধ তুমি পাবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০১০)*। আসুন! আমরা নিজে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করি এবং আমাদের সন্তানদের উত্তম ও ভাল বন্ধু বা সঙ্গী-সাথী নির্বাচনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে উত্তম বন্ধু নির্বাচনের তাওফীক দাও। আমীন!!

১২. আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে ঘন ঘন না বেড়ানো :

বর্তমান সমাজে সোনামণি ও যুবক-যুবতীদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষকের বাড়ীতে একা একা বেড়াতে যাওয়া ও অবস্থান করা যেন রীতিতে পরিণত হয়েছে। যা না করলে যেন ছাত্র-ছাত্রীদের মর্যাদা রক্ষা হয় না বা মান-সম্মান থাকে না। এটা সম্পূর্ণরূপে অনৈসলামিক কালচার। ইসলামী অনুশাসনে এর কোন ভিত্তি নেই। একজন সোনামণি অথবা যুবক-যুবতী যখন তার গার্ডিয়ান ব্যতীত একা একা মামা, খালা, ফুফু, চাচা, শিক্ষক, দুলাভাই, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে বেড়াতে যায়, তখন ঐ বাড়ীতে অবস্থানরত অন্যান্য যুবক-যুবতীদের সাথে তাদের পরিচিতি, সখ্যতা ও ঘনিষ্টতা হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর বিশেষ করে যুবতী মেয়েরা যখন কোন বাড়ীতে একা একা বেড়াতে যায় ও অবস্থান করে, তখন তাদের বেশীরভাগই অতিদ্রুত খারাপের দিকে চলে যায়; যা সহজে চিন্তায় আসে না বা বুঝা যায় না। আরও একটা কালচার এর চেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক যে, নিজ বাড়ীতে অথবা স্যারের বাড়ীতে বিশেষ করে ছাত্রীদের একাকী প্রাইভেট পড়ার সুযোগ করে দেওয়া। এর মধ্যে লাভের চেয়ে ক্ষতির অংশ যে কত বেশী তা সহজে মিলাতে পারবেন না। অতএব আসুন! উল্লেখিত বিষয়ে আমরা যথাযথ সর্তকতা অবলম্বন করি এবং সোনামণিদের ইসলামী প্রশিক্ষণ প্রদান করি।

১৩. কল্পনাপ্রবণ ও স্বপ্নাশ্রয়ী শিশু-কিশোরদের মনের খোরাকের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা :

সোনামণি তথা শিশু-কিশোরগণ তাদের মনে বিভিন্ন ধরনের কল্পনা আঁকে। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখে। এজন্যই সোনামণি সংগঠন সোনামণিদের জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষা, কবিতা, সংলাপ, ইসলামী গল্প ও বিভিন্ন উপদেশমূলক গল্প ও বিজ্ঞানকে সিলেবাসভুক্ত করেছে। যা শিশু-কিশোরদের মনের অনেক কল্পনা ও স্বপ্নের খোরাক দিতে সক্ষম। এগুলির মাধ্যমে তাদের মেধা ও মননের দ্বার উন্মুক্ত হয়। যদিও বয়স্ক বা বৃদ্ধ দায়িত্বশীলরা এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না, সহযোগিতা করেন না এবং এরকম কোন কার্যাবলী পছন্দও করেন না। কারণ তাঁদের এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা নেই। বয়স্ক দায়িত্বশীলদের তাই বুঝিয়ে ম্যানেজ করে নিতে হবে। পড়াশুনার পাশাপাশি এ ধরনের প্রতিযোগিতা, সংলাপ ও সাধারণ জ্ঞানে তারা সর্বদা পুলকিত হয়। তাদের সুপ্ত মেধা শক্তি বিকশিত হয় এবং সকল কাজে তারা আগ্রহী হয়ে উঠে। মনটাকে কাজ দাও, তাহলে সে ভাল থাকবে। সুস্থ থাকবে, সুন্দর থাকবে। তারা যেন সর্বদা ঝামেলামুক্ত, অভাবহীন ও শোষণমুক্ত সুন্দর সমাজ, দেশ, জাতি ও পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবনের অনেক আল্পনা আঁকে। তাই আমরা তাদেরকে সে সুযোগ করে দেই। তাহলে তারা হবে সত্যাশ্রয়ী। যাবতীয় অন্যায়, অসত্য, অবিচার, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বদা সচেতন ও সংগ্রামী। সোনামণি সংগঠন সহ সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের এ সংগঠন সম্পর্কে যথারীতি পড়াশুনার সাথে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণার জন্য বিশেষ উদ্যমী ও আগ্রহী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং শিশু-কিশোরদের বেশী বেশী করে আদর করব, ভালবাসব। কারণ তারা নিষ্পাপ অথবা তাদের পাপের ফিরিস্তি অনেক কম।

১৪. সর্বদা নিজের ও পরিবারের সৌন্দর্য চেতনা ও রুচিশীলতা বজায় রাখা :

মহান আল্লাহ সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। তিনি সুন্দর ও সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) সৌন্দর্য ও পবিত্রতাকে আজীবন লালন করেছেন। তিনি ছালাতে গমনের সময় আতর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্র বাণী, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ (অন্তর থেকে) তাওবাকারী ও (দৈহিকভাবে) পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারহা ২২২)*। বর্তমান সমাজে অনেক ইসলামপন্থীদের সৌন্দর্যচেতনা ও রুচিশীলতার অভাবে রুচিশীল সাধারণ মানুষ ও সোনামণিরা তাঁদেরকে এড়িয়ে চলে। তাঁদের সাথে মিশতে, সংগঠন করতে ও ইসলামী জ্ঞানার্জন করতে আগ্রহী হয় না। তাদেরকে সেকেলে, সভ্যতাহীন ইত্যাদি বলা হয়। সোনামণি সংগঠনের দায়িত্ব পালনকালে আমি বিশেষ করে এসব তথ্যের বাস্তব সত্যতা পেয়েছি। তাই আমি ইমাম, মুয়াযিযনসহ সকল ইসলাম অনুরাগীদেরকে সৌন্দর্যসচেতন ও রুচিশীল হওয়ার অনুরোধ জানাই। এক্ষেত্রে ময়লা ও অপরিষ্কার পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশেষত মেয়েদের কপালে টিপ, হাত ও পায়ে বড় বড় রঙ-বেরঙের নখ, মুখ, নাক ও দাঁত অপরিষ্কার, পাঞ্জাবীর পকেট ও বোতাম ছেড়া এবং প্রসাব করতে বসার সময় পাঞ্জাবী ঝুলে পড়া ও দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করা ইত্যাদিসহ এ ধরনের আরও অনেক অসুন্দর, মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১৫. ওলামা-মাশায়েখ ও ধর্মীয় শিক্ষকগণের আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও সঠিক ইসলামী আক্বীদার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা :

বর্তমান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে অন্যান্য সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ওলামা মাশায়েখ ও ধর্মীয় শিক্ষকগণকে সঠিক ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত ও সক্রিয় হতে হবে। মহান আল্লাহ্র বাণী وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 'আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়' *(নূর ১৮,৫৮ ও ৫৯)*। আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 'তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলনা, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং এ সংবাদ পৌঁছে দিতে পারে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা বাঁচতে পারে' *(তাওবা ১২২)*। সমাজে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য ইসলামী দাওয়াতের সাথে সাথে সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ওলামা-মাশায়েখদের এগিয়ে আসতে হবে। আর সকল মানুষকে তাদের মর্যাদানুপাতে সম্মান করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশের এই ঘুণে ধরা সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ ও শিশু-কিশোরদের ওলামাদের প্রতি তাদের উল্লেখিত ধারণা পাল্টাতে হবে। তাদেরকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তাহলেই আসবে পরিবর্তন ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার

আমাদের সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই ৫৬,০০০ বর্গমাইলের বাংলাদেশে প্রায় ৮ কোটি সোনামণির বাস। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও আমাদের শিশু-কিশোরেরা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে পাশ্চাত্যের আদর্শের দিকে। এমতাবস্থায় পূর্বগগণে উদিত সকালের রক্তিম সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়েছে দিকভ্রান্ত শিশু-কিশোরদেরকে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার দৃপ্ত শপথ নিয়ে জন্ম নেয়া সোনামণি সংগঠন। কবির ভাষায় *'উষর মরুর ধুসর বুকে বিশাল যদি শহর গড়, একটি জীবন সফল করা তাহার চেয়ে অনেক বড়'*। তাই এদেশের সকল মুসলিমের প্রতি বিনীত উদাত্ত আহ্বান, তারা যেন তাদের প্রাণপ্রিয় অতি আদরের শিশুসন্তানকে সোনামণি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করে শৈশব থেকেই রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার সুযোগ করে দেন। পরিশেষে এ সংগঠনের স্থায়িত্বের জন্য সময়, শ্রম, মেধা, মনন ও অর্থ ব্যয় করার নিমিত্তে মহান আল্লাহ্র মদদ কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!!

[লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি]

তাক্বলীদ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য

-আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

ইসলামের প্রসিদ্ধ চার ইমাম প্রত্যেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত, মুত্তাক্বী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। তাঁরা পার্থিব পদমর্যাদা ও সম্মানের লোভী ছিলেন না। তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের ও অন্য মানষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তুলেতে সচেষ্ট থাকায় তারা অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কোন মাসআলা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে না পেলে তাঁরা ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ফায়সালা প্রদান করেছেন। তাতে ভুল হলেও তাঁরা ছাওয়াবের অধিকারী হয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, ‘বিচারক যখন সঠিক রায় প্রদানে সচেষ্ট থেকে সঠিক ফায়সালা প্রদান করে তখন তার জন্য দুটি নেকী রয়েছে। আর যখন সঠিক রায় প্রদানে সচেষ্ট থেকেও ভুল ফায়সালা প্রদান করে তাহ’লে তার জন্য একটি নেকী রয়েছে *(ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, ‘কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা’ অধ্যায়, ‘বিচারক ঠিক করুক বা ভুল করুক তার প্রতিদান পাবে’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (ঢাকা, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২০১২) ৬/৪৬৮ পৃঃ, ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৬)*।

উপরোক্ত হাদীছের ভিত্তিতে ইমামগণ ইজতিহাদ বা শরী‘আত গবেষণা করে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে তাঁরা এটাও আশঙ্কা করেছেন যে, তাঁদের কথা ভুলও হ’তে পারে। সেজন্য তাঁরা তাদের তাক্বলীদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এক্ষণে প্রসিদ্ধ চার ইমামের প্রচলিত চার মাযহাবের জন্মদাতা এবং তাঁরাই একমত হয়ে যে কোন একটি অনুসরণ উম্মাতে জন্য ফরয (?) করে গিয়েছেন। এমনকি তাবলীগী ভাইয়েরা চিল্লাতে গিয়েও কবিতাকারে তাদের লোকদের ১৩০ ফরযের মধ্যে চার মাযহাবকে চার ফরয হিসাবে তা‘লীম দিয়ে থাকেন ও মুখস্থ করিয়ে থাকেন–তার সত্যতা কতটুকু? নিম্নে প্রদত্ত মাননীয় চার ইমামের জন্ম মৃত্যু সন ও তাদের উক্তিগুলো বিচার করলেই উপরের ধারণাগুলির অসারতা বুঝা যায়।

এক নযরে চার ইমামের পরিচিতি :

ক্রম	নাম	জন্ম	মৃত্যু	জন্মস্থান
১	আবু হানীফা নু‘মান বিন ছাবিত (রহঃ)	৮০ হিঃ	১৫০ হিঃ	কূফা, ইরাক
২	মালিক বিন আনাস (রহঃ)	৯৩ হিঃ	১৭৯ হিঃ	মদীনা মুনাওয়ারা
৩	মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (রহঃ)	১৫০	২০৪	গাযা, ফিলিস্তীন। বসবাস মক্কায়।
৪	আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)	১৬৪	২৪১	বাগদাদ, ইরাক

উপরোক্ত চার ইমাম ছাড়াও যাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে তাঁরা হলেন, রবী‘আতুর রায় মাদানী (মৃত ১৩৬ হিঃ), মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা আনছারী মাদানী (মৃত ১৪৮ হিঃ), আব্দুর রহমান বিন আমর আওযাঈ সিন্ধী কূফী (৮৮-১৫৭ হিঃ), সুফিয়ান বিন সাঈদ ছওরী কূফী (৯৭-১৬১ হিঃ), লাইছ বিন সা‘আদ মিসরী (৯৪-৪৭৫ হিঃ), ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহে নিশাপুরী (১৬৬-২৩৮ হিঃ), দাঊদ বিন আলী ইসফাহানী তাহেরী (২০০-২৭২০ হিঃ), আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী বাগদাদী (২২৪-৩১০ হিঃ), ইমাম তাক্বিউদ্দীন আহমাদ বিন আব্দুল হালীম ইবনু তায়মিয়াহ হার্‌রানী দামেস্কী (৬৬১-৭২৮ হিঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ। এদের কেউ ৮০ হিজরীর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেননি। অথচ ইসলামের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হয়েছে এদের পূর্বেই এবং তাঁরা সহ আহলেসুন্নাত-এর সকল বিদ্বানই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে তাঁদের তাক্বলীদ করতে সকলকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন :

তাক্বলীদ সম্পর্কে চার ইমাম বক্তব্য

ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) :

১– إياكم والقول في دين الله تعالي بالراي وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل–

(১) ‘তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে নিজ নিজ রায় অনুযায়ী কথা বলা হ’তে বিরত থাক। তোমাদের জন্য সুন্নাতের অনুসরণ করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যাবে সে পথভ্রষ্ট হবে’ *(আব্দুল ওয়াহহাব শা‘রানী (৮৯৬-৯৭৩ হিঃ) কিতাবুল মীযান (দিল্লী : আহযাহুল মাতাবে, ১২৮৬ হিঃ) ১/৬৩ পৃঃ; তিনটি মতবাদ ১৫ পৃঃ)*।

২– حرام علي من لم يعرف دليلي ان يفتي بكلامي–

(২) ‘আমার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া হারাম ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার গৃহীত দলীল সম্পর্কে অবগত নয়’ *(তদেব)*। এখানে ইমাম ছাহেব তাঁর তাক্বলীদ করতে নিষেধ করছেন এবং তাঁর দলীল যাচাই করে সে অনুযায়ী ফৎওয়া দিতে বলেছেন। যা দলীলের অনুসরণ বা ইত্তেবায়ে সুন্নাত, তাক্বলীদ নয়। অতঃপর তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন-

৩- إذا صح الحديث فهو مذهبي–

(৩) ‘যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব’ *(ইবনু আবেদীন, শামী রদ্দুল মুহতার শারহ দুর্রে মুখতার (দেউবন্দ, ১২৭২ হিঃ) ১/৪৬ পৃঃ; তিনটি মতবাদ ১৬ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন ৭ পৃঃ)*।

٤– إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلي الله عليه وسلم فاتركوا قولي–

(৪) ‘আমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার (হাদীছ) বিরোধী কোন কথা বলে থাকি, তাহ’লে আমার কথাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও’ *(ছাহেল ফুল্লানী, ইক্বায়ু হিমাম ৫০ পৃঃ)*।

একবার তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হিঃ)–কে বলেন,

৫– لا ترو عني شيئا فإني والله ما ادري مخطي ام مصيب؟

(৫) ‘তুমি আমার পক্ষ হ’তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্‌র ক্বসম আমি জানিনা নিজ সিদ্ধান্তে আমি বেঠিক না সঠিক’

(আবু বকর খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ১৩/৪০২ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৭৯ পৃঃ-এর ৪৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

٦- ويحكم يكذبون علي في هذه الكتب مالم اقل.

(৬) 'আরেকবার তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন, তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা এইসব কিতাবগুলিতে আমার উপরে কত মিথ্যা আরোপ করেছ, যা আমি বলিনি' *(তদেব)*।

٧- وكان إذا افتي يقول هذا راي ابي حنيفة وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاء باحسن منه فهو اولي بالصواب-

(৭) তিনি ফৎওয়া দিলে বলে দিতেন যে, এটি আবু হানীফার রায়। আমাদের সাধ্যপক্ষে এটিই উত্তম মনে হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম পেলে সেটিই সঠিকতর বলে গণ্য হবে *(কিতাবুল মীযান, ১/৬০ পৃঃ, তিনটি মতবাদ ১৬ পৃঃ)*।

٨- لا يحل لاحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه-

(৮) আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি তা না জেনে আমাদের কথা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয় *(হাশিয়া ইবনু আবেদীন, ১/৬৩; মুক্বাদ্দামাতু ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), অনুবাদ : তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২০১১, ২৩ পৃঃ)*।

٩- فاننا بشر نقول القوم اليوم ونرجع غدا-

(৯) কেননা আমরা মানুষ। আজ এ কথা বলি, আবার আগামীকাল তা থেকে প্রত্যাবর্তন করি *(মুক্বাদ্দামাতু ছিফাতি ছালাতিন নাবী (ছাঃ), ২৪ পৃঃ)*।

١٠- ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فاني قد اري الراي اليوم فاتركه غدا اري الراي غدا واتركه بعد غد-

(১০) তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফকে তাঁর বক্তব্য লিখতে দেখে ধমক দিয়ে বলেন, 'সাবধান! হে ইয়াকুব (আবু ইউসুফ) আমার নিকট থেকে যাই শোন, তাই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি, কাল যে রায় দেই পরদিন তা পরিত্যাগ করি *(তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৭৯ পৃঃ-এর ৪৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য; মুক্বাদ্দামাতু ছিফাতি ছালাতিন নাবী (ছাঃ) ২৫ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন ৭ পৃঃ)*।

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) :

١- انما انا بشر اخطي واصيب فانظروا في راي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافقه فاتركوه-

(১) আমি একজন মানুষমাত্র। আমি ভুল করি সঠিকও করি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলি তোমরা যাচাই কর। যেগুলি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পাও, সেগুলো গ্রহণ কর। আর যেগুলো না পাও সেগুলো পরিত্যাগ কর *(ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ (বোম্বাই: পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাবি) ৭৩ পৃঃ; ইমাম ইবনু হাযাম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৬/১৪৯ পৃঃ; তিনটি মতবাদ ১৬ পৃঃ)*।

٢- ما من احد الا ومأخذوه من كلامه و مردود عليه الا رسول الله صلي الله عليه وسلم-

(২) তিনি মূলনীতি আকারে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সকল কথা গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় *(শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইকদুল জীদ অনুবাদসহ (লাহোর, তাবি), ৯৭ পৃঃ; তিনটি মতবাদ ১৬-১৭ পৃঃ; ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৬/১৪৯ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে **هذه الروضة الا صاحب** 'এই কবরবাসী (রাসূল ছাঃ) ব্যতীত' *(কিতাবুল মীযান ১/৬৪ পৃঃ; তিনটি মতবাদ ১৭ পৃঃ)*।

٣- ليس احد بعد النبي صلي الله عليه وسلم الا ويؤخذ من قوله و يقوله من النبي صلي الله عليه وسلم-

(৩) নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের কথা সব গ্রহণীয় কিংবা বর্জনীয় নয় (কিন্তু নবী (ছাঃ)-এর সকল কথা গ্রহণীয় ও বর্জনীয়) *(ছিফাতু ছালাতিন নাবী ২৭ পৃঃ)*।

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) :

١- إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط و قال يوما للمزني يا ابراهيم لا تقلدني في كل ما اقول وانظر في ذالك لنفسك فانه دين-

(১) 'যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুড়ে মারবে। তিনি একদা স্বীয় ছাত্র ইবরাহীম মুযানীকে বলেন, 'হে ইবরাহীম! তুমি আমার সকল কথার তাক্বলীদ করবে না। বরং নিজে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। কেননা এটা দ্বীনের ব্যাপার' *(ইকদুল জীদ ৯৮ পৃঃ; তিনটি মতবাদ ১৭ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৭৭ পৃঃ-এর ২৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য)*।

٢- كل ما قلت فكان عن النبي صلي الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي اولي فلا تقلدني-

(২) আমি যেসব কথা বলেছি, তা যদি নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছের বিপরীত হয় তবে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছই অগ্রগণ্য। অতএব তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না *(ইবনু আবী হাতিম, ৯৩ পৃঃ সনদ ছহীহ, ছিফাত ৩৩ পৃঃ)*।

٣- كل حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم فهو قولي وان لم تسمعه-

(৩) নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রত্যেকটি হাদীছই আমার কথা যদি আমার নিকট থেকে তোমরা তা না শুনে থাক তবুও *(তদেব)*।

٤- ما من احد الا و تذهب عليه سنة لرسول الله صلي الله عليه وسلم وتعزب عنه مهما قلت من قول او أصلت من اصل فيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو قولي-

(৪) 'প্রত্যেক ব্যক্তি থেকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কিছু সুন্নাত গোপন থাকবেই এবং ছাড়া পড়বেই। তাই আমি যত কথা বলেছি অথবা মূলনীতি উদ্ভাবন করেছি সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য পাওয়া গেলে তাঁর কথাই চূড়ান্ত এবং এটিই হবে আমার গ্রহণীয় কথা'।-ছিফাত (মূল), পৃ. ৫০; বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ) পৃ. ২৯।

٥- اجمع المسلمون علي ان من استبان له سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعها لقول أحمد-

(৫) 'মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, যার কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ (হাদীছ) পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়ে যায় তার পক্ষে অন্য কারো কথায় তা বর্জন করা বৈধ নয়। *-তদেব*।

٦- إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ودعوا ما قلت وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتواالي قول احد-

(৬) যখন তোমরা আমার কিতাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাবে, তখন তোমরা তাঁর সুন্নাতানুসারে কথা বলবে এবং আমি যা বলেছি তা ছেড়ে দেবে।

অপর বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা তাঁরই সুন্নাতের অনুসরণ কর এবং অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না *(পূর্বোক্ত, বঙ্গানুবাদ ছিফাত, পৃ. ৩০)*।

٧– أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فاذا كان الحديث الصحيح فاعلموني به اي شيئ يكون كوفيا او بصريا أو شاميا حتي اذهب اليه إذا كان صحيحا–

(৭) (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) কে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন) আপনারাই হাদীছ এবং তার রিজালের (বর্ণনাকারীদের) ব্যাপারে আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। তাই ছহীহ হাদীছ পেলেই আমাকে অবহিত করবেন, চাই তা কূফী, বাছরী বা শামীদের (সিরিয়া) বর্ণনাকৃত হোক, ছহীহ হলে আমি তা গ্রহণ করব *(তদেব)*।

٨– كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم عند اهل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها في حياتي و بعد موتي–

(৮) আমি যে মাসআলা বলেছি, তাতে আমার কথার বিরুদ্ধে হাদীছ বর্ণনাকারীদের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম *(ইলামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/৩৬৩ পৃ. ছিফাত, পৃ. ৫২; অনুবাদ ছিফাত পৃ.৩২)*।

٩–إذا رايتموني اقول قولا وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم خلافه فاعلموا ان عقلي قد ذهب–

(৯) যখন তোমরা দেখবে যে, আমি এমন কথা বলছি, যার বিরুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধ হাদীছ রয়েছে। তবে জেনে রেখ যে, আমার বিবেক হারিয়ে গেছে *(তদেব)*।

١٠– إذا صح الحديث فهو مذهبي–

(১০) যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব *(তদেব)*।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) (১৬৪-২৪১হি)

١– لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب والسنة–

(১) তুমি আমার তাক্বলীদ করো না, তাক্বলীদ করো না ইমাম মালেক, আওযাঈ, নাখঈ বা অন্য কারও। বরং নির্দেশ গ্রহণ কর কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎস থেকে, যেখান থেকে তাঁরা সমাধান গ্রহণ করতেন *(ইক্বদুল জীদ, পৃ ৯৮, থিসিস পৃ ১৭৭ টিকা নং-২৪; তিনটি মতবাদ, পৃ ১৭, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ২/৩০২ পৃঃ)*।

٢–لا تقلد دينك احدا من هولاء ما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه فخذ به–

(২) তুমি দ্বীনের ব্যাপারে তাঁদের তাক্বলীদ করো না (বরং) নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের থেকে যা আসে তা গ্রহণ করা *(ছিফাত, ৪৬-৫৩ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ৩৩-৩৪ পৃঃ)*।

٣– رأي الاوزاعي و رأي مالك و رأي ابي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وانما الحجة في الاثار–

(৩) ইমাম আওযাঈ, মালেক ও আবু হানীফা প্রত্যেকের মতামত হচ্ছে মতামতই এবং আমার কাছে তা সমান মূল্য রাখে। তবে প্রকৃত দলীল রয়েছে কেবল হাদীছের মধ্যে *(তদেব)*।

٤– من رد حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو علي شفا هلكة–

(৪) যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে প্রত্যাখ্যাক করল সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হ'ল *(তদেব)*।

মহামতি চার ইমামের পর অন্যান্য ওলামায়ে কেরামগণের বক্তব্য

১. ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, আমার উস্তাদ বলেন, আমি মুক্বাল্লিদ ফকীহদের একটি দলকে দেখেছি যখন আমি তাদের সম্মুখে কোন বিষয়ে অনেকগুলি আয়াত পড়ি যা তাদের মাযহাবের বিরোধী তখন তারা তা কবুল করে না। এমনকি সেদিকে দৃকপাতও করেনা। তারা আমার দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে এই সব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের উপরে কিভাবে আমল করা যেতে পারে। অথচ আমাদের পূর্বসূরী বিদ্বানদের পক্ষ হতে এর বিরোধী বক্তব্য প্রচলিত আছে। যদি তুমি বিষয়টিকে যথার্থভাবে অনুধাবন কর তবে দেখবে যে, এই রোগ দুনিয়াবাসীর শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত আছে *(আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৫২ পৃঃ)*।

● তিনি আরো বলেন, যদি মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, কোন মানুষের প্রতি তাক্বলীদ সিদ্ধ হবার শর্ত হ'ল একথা জ্ঞাত হওয়া যে, ঐ ব্যক্তি হক্ব-এর উপরে আছেন একথা তুমি স্বীকার কর কি-না? যদি স্বীকার কর তাহ'লে জিজ্ঞেস করব তুমি কিভাবে জানলে যে, লোকটি হক-এর উপর আছেন? যদি তুমি অন্যের তাক্বলীদ করে থাক, তাহ'লে তো গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে গেল। আর যদি তুমি তোমার জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে থাক, তাহ'লে তো আর তাক্বলীদের দরকার নেই, তোমার জ্ঞানই যথেষ্ট। যদি তুমি বল যে, ঐ ব্যক্তি হক্বপন্থী কিনা তা জানা বা না জানার উপরে তাক্বলীদ নির্ভর করে না। তাহ'লে তো বলা হবে যে, ঐ ব্যক্তি বাতিলপন্থী হলেও তুমি তার তাক্বলীদ সিদ্ধ করে নিলে। এমতাবস্থায় তুমি জানতে পারনা তুমি হক্বপন্থী না বাতিলপন্থী। জেনে রাখা ভাল যে, পূর্বের আয়াতে *(বাক্বারাহ ১/১৬৮)* 'শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার' জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করার পরেই এই আয়াত *(বাক্বারাহ ২/১৭০)* বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, শয়তানী ধোঁকার অনুসরণ করা ও তাক্বলীদ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব এই আয়াতের মধ্যে মযবুত প্রমাণ নিহিত রয়েছে 'দলীলের অনুসরণের' এবং চিন্তা গবেষণা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ও দলীল বিহীন কোন বিষয়ের দিকে নিজেকে সমর্পণ না করার ব্যাপারে *(তাফসীরুল কাবীর ৫/৭ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৫৪ পৃঃ)*।

২. আল্লামা সৈয়দ রশীদ রেযা (১১৮২ হিঃ/১৩৫৪ হিঃ-১৮৬৫ খ্রিঃ/১৯৩৫খ্রিঃ) সূরা মায়েদার (৫/৩)-এর আয়াতে দ্বীনের পূর্ণতা বিষয়ক আলোচনায় তিনি তাক্বলীদ কিভাবে ইলমকে ধ্বংস করেছে এবং তাক্বলীদপন্থী আলেমগণ কিভাবে কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় ব্যক্ত করে বলেন, দ্বীনের পথে মানুষকে আহ্বান ও সেজন্য বিগত পথ অনুসরণের ব্যাপারটি **(فبهداهم اقتده)** *(আন'আম ৬/৯০)* দ্বারা তাক্বলীদ প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এর প্রকৃত তাৎপর্য স্বচ্ছ সকালের চাইতেও স্বচ্ছ। কিন্তু মুক্বাল্লিদ গ্রন্থকারদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে মন্দ রীতির উপর চলেছেন।...মানবীয় উন্নতির জন্যই আমাদের দ্বীনকে পূর্ণ ও চিরস্থায়ী করা হয়েছে, যার উপরে আমল করা ওয়াজিব। এটা আমাদের অন্যতম প্রধান মূলনীতি। যেটা বুঝতে অনেক বিদ্বান সন্দেহে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন *(সাইয়িদ রশীদ রেযা, তাফসীরুল কুরআন (মিসর : দারুল মানার, ২য় সংস্করণ ১৩৬৭/১৯৪৮, ৬/৪১৬ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৫৬)*।

৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী তাঁর প্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থে তাক্বলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সর্বত্র তিনি অন্ধ তাক্বলীদের **(تقليد جامد)** কঠোর সমালোচনা করেছেন। যেমন-তিনি

বলেন, (হে পাঠক!) বর্তমান সময়ে তুমি বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে দেখবে যে, তারা বিগত কোন বিদ্বানের মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে এবং তারা মনে করে যে, মাত্র একটি মাসআলাতেও যদি তার অনুসরণীয় বিদ্বানের তাক্বলীদ হ'তে সে বেরিয়ে যায়, তাহ'লে হয়তোবা সে মুসলিম মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী যাকে তার কাছে পাঠানো হয়েছে। অথচ চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার কোন মুসলমান কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহবের অনুসারী ছিলেন না *(শাহ ওয়ালিউল্লাহ, তাফহীমাতুল ইলাহিয়াহ, আরবী ও ফারসী (ইউপি-ভারত : মদীনা অফসেট প্রেস, বিজনৌর, ১৩৫৫/১৯৩৬) ১/১৫১ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৬০ পৃঃ)*।

● তিনি আরো বলেন, 'কোন ইমামের মুক্বাল্লিদের নিকট কোন মাসআলায় যদি রাসূলের (ছাঃ) কোন হাদীছ পৌঁছে যায়, যা তার ইমামের কথার বিরোধী হয় এবং তার ধারণা যদি জোরালো হয় যে, হাদীছটি ছহীহ, তাহ'লে অন্যের অজুহাতে রাসূলের (ছাঃ) হাদীছকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তার কোন কথা কাজে আসবে না। এটা কোন মুসলমানের শান নয়। যদি কেউ করে তবে মুনাফিক হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে' *(প্রাগুপ্ত ২/১৩৪ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৬১ পৃঃ)*।

● মুজতাহিদদের তাক্বলীদকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ওয়াজিব ও হারাম দু'ভাগে ভাগ করেছেন :

১. ওয়াজিব হ'ল রেওয়াতের অনুসরণ করা। এর ব্যাখ্যা এই যে, কিতাব ও সুন্নাহ সম্পর্কে আনকোরা ব্যক্তি যিনি এসব অনুসন্ধান ও সমাধান বের করতে অক্ষম, তার দায়িত্ব হ'ল কোন বিদ্বানকে জিজ্ঞেস করা যে, এই মাসআলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুকুম কি? তখন উক্ত বিদ্বান তাকে খবর দিবেন তখন তিনি তার অনুসরণ করবেন। চাই সে খবর প্রকাশ দলীল থেকে গৃহীত হোক বা তার সদৃশ বিষয়ের উপরে কিয়াস করে হোক। সবকিছুই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেওয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে মর্মগতভাবে। এই ধরনের তাক্বলীদের (বরং ইত্তেবার) উপর যুগ যুগ ধরে উম্মতের ঐক্যমত চলে আসছে। বিগত উম্মত গুলির শরী'আতেও এ ব্যাপারে ঐক্যমত ছিল। এই তাক্বলীদ অর্থ হ'ল ঐ ব্যক্তি মুজতাহিদের কথার উপরে আমল করবে এই শর্তে যে, বিষয়টি সুন্নাতের অনুকূলে হবে। অতঃপর লোকটি সর্বদা তার সাধ্যমত সুন্নাতের সন্ধানে থাকবে। যখন তার নিকটে মুজতাহিদের কথার বরখেলাফ কোন হাদীছ প্রকাশিত হবে, তখনই সে হাদীছ গ্রহণ করবে (এবং উক্ত কথা ছেড়ে দিবে)।

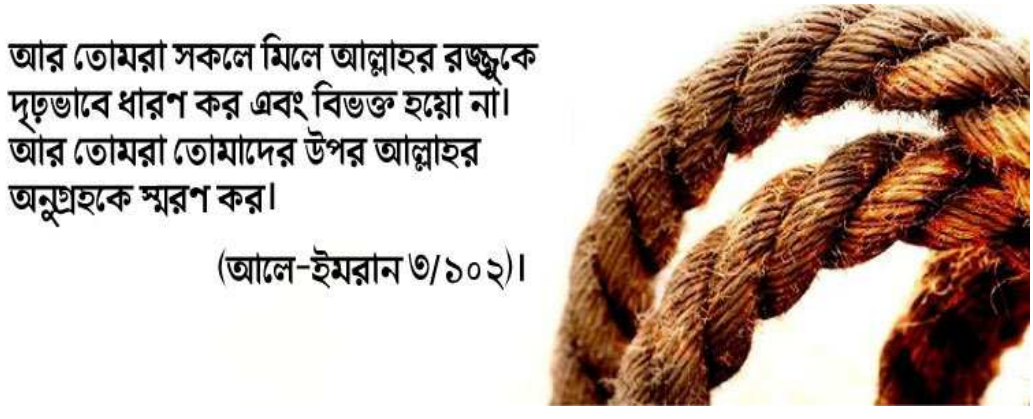

২. তাক্বলীদ হারাম ঐ সময়ে যখন মুজতাহিদ ফক্বীহ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করেন যে, তিনি জ্ঞানের এমন উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গিয়েছেন, যেখানে তার আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে উক্ত মুজতাহিদের বক্তব্য বিরোধী কোন স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ তাঁর নিকটে পৌঁছে গেলেও তিনি ঐ ফৎওয়া পরিত্যাগ করেন না। বরং ধারণা করেন যে, তিনি যার তাক্বলীদ করেন তিনিই তার ফৎওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন। এই মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিটি যাবতীয় গুণহীন বেওকুফের মত।... এই আক্বীদা সম্পূর্ণ বাতিল এবং এই কথা সম্পূর্ণ বাজে। এর পক্ষে শরী'আত বা যুক্তির কোন দলীল নেই। বিগত যুগের কেউ এমন করেননি *(অলিউল্লাহ, ইকদুল জীদ (লাহোর, তাবি) ৮৪-৮৬ পৃঃ, আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৬২ পৃঃ)*।

● হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোন বিদ্বানের তাক্বলীদের উপর যিদ করাকে তিনি 'ইহুদী স্বভাব' বলে ভীষণভাবে কটাক্ষ করে বলেন, যদি তুমি ইহুদীদের নমুনা দেখতে চাও তাহ'লে দুষ্ট আলেমদের দিকে তাকাও যারা দুনিয়ার সন্ধানী। যারা বিগত কোন ব্যক্তির তাক্বলীদে অভ্যস্থ। যারা কিতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কোন একজন আলিমের সূক্ষ্মবাদিতা, কঠোরতা ও সুধারণাযুক্ত সমাধান (ইসতিহসান)-কে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে। যারা মা'ছুম রাসূলের কালাম হ'তে বেপরওয়া হয়ে বিভিন্ন জাল হাদীছ ও বাতিল ব্যাখ্যাসমূহ (তা'বীল) কে অনুসরণীয় হিসাবে গ্রহণ করে। তামাশা কেমন তারা যেন খোদ ইহুদী *(আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৬৫ পৃঃ)*।

● তিনি বলেন, নিছক মুক্বাল্লিদ কোন ব্যক্তি কখনই সত্যে উপনীত হতে পারে না। বরং পৃথিবীর অধিকাংশ ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা তাক্বলীদের উৎস হ'তেই পয়দা হয়েছে *(আহলেহাদীছ আন্দোলন ২৬৭ পৃঃ)*।

● তাক্বলীদপন্থী আলেমগণের ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন, এদের সমস্ত ইলমের পুঁজি হ'ল হেদায়া, শরহে বেকায়া প্রভৃতির মধ্যে। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে *(তদেব)*।

৪. শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ/১৭৭৯-১৮৩১ খ্রিঃ) অনির্দিষ্ট ভাবে যে কোন আলেমের তাক্বলীদ সম্পর্কে হাফেয ইরাক্বী প্রমুখাৎ ইজমার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ...ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও যদি মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিটি তার ইমামের কথা পরিত্যাগ না করে, তাহ'লে (বুঝতে হবে যে তার মধ্যে শিরকের দোষ মিশ্রিত আছে।... একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথার অনুসরণ করা এই অর্থে যে, তার বিপরীত হাদীছ বা কুরআনের দলীল সমূহ প্রমাণিত হলেও তা ঐ ব্যক্তির কথার অনুকূলে ব্যাখ্যা করা হবে তাহ'লে তার মধ্যে নাছারাদের স্বভাব ও শিরকের অংশ বিশেষ মিশ্রিত হয়ে যাবে *(শাহ ইসমাঈল শহীদ, তানভীরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রাফ'ইল ইয়াদাইন (মীরাট : মুজতাবায়ী প্রেস ১২৭৯হি/১৮৩৬ খ্রিঃ, উর্দু অনুবাদসহ ৩৭-৩৯ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন ১৬৬ পৃঃ)*।

৫. শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ নাযীর হুসাইন বিহারী দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিঃ/১৮০৫-১৯০২ খ্রিঃ) তাক্বলীদকে চারভাগে ভাগ করেছেন (ক) ওয়াজিব : জাহিল ব্যক্তির জন্য। যে আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে যে কোন বিদ্বানের নিকট হ'তে প্রয়োজন মাফিক মাসআলা জেনে নিবে। তবে এই তাক্বলীদ হবে হাদীছের অনুকূলে হওয়ার শর্তসাপেক্ষে। যদি পরে দেখা যায় যে, ফৎওয়াটি ছিল হাদীছ

বিরোধী। তবে তখনই সেটা পরিত্যাগ করে তার জন্য হাদীছের অনুসরণ আবশ্যক হবে।

(খ) মুবাহ : কোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করা এই নিয়তে যে, এই তাক্বলীদ কোন শারঈ বিষয় নয়। অন্য মাযহাবের হাদীছ সম্মত কোন মাসআলার ইনকার করবে না। বরং নিজেও কখনও কখনও তার উপরে আমল করবে।

(গ) হারাম : ওয়াজিব মনে করে কোন একটি মাযহাব নির্দিষ্টভাবে তাক্বলীদ করা।

(ঘ) শিরক : অজ্ঞতার কারণে কোন একজন মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী আমল করা। কিন্তু পরে ছহীহ ও গায়র মানসূখ হাদীছ পাওয়া গেলেও তা প্রত্যাখ্যান না করা অথবা তাহরীফ বা তাবীল করে যেকোন ভাবেই হোক হাদীছকে ঐ মুজতাহিদের কথার অনুকূলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু কোন অবস্থাতেই অনুসরণীয় বিদ্বানের কথাকে পরিত্যাগ না করা *(সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলভী, মি'আরুল হক্ব (উর্দু) (দিল্লী : রহমানী প্রেস ১৩৩৭ হিঃ/১৯১৯ খ্রিঃ, ৪১-৪২ পৃঃ)*।

৬. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ) বলেন,

وقد علم كل عالم أنهم (أي الصحابة والتابعين وتابعهم) لم يكونوا مقلدين ولا منتسبين إلي فرد من افراد العلماء بل كان الجاهل يسئل العالم عن الحكم الشرعي الثابت في كتاب الله او بسنة رسوله صلي الله عليه وسلم فيفتيه به ويرويه له لفظا أو معني فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي و هذا اسهل من التقليد–

প্রত্যেক বিদ্বান এ কথা জানেন যে, ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন কেউ কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। ছিলেন না কেউ কোন বিদ্বানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। বরং জাহিল ব্যক্তি আলেমদের নিকট থেকে কিতবা ও সুন্নাহ হ'তে প্রমাণিত শরী'আতের হুকুম জিজ্ঞেস করতেন। আলেমগণ সেই মোতাবেক ফৎওয়া দিতেন। কখনও শব্দে শব্দে বলতেন, কখনও মর্মার্থ বলে দিতেন। সে মতে লোকেরা আমল করত (কুরআন ও হাদীছের) রেওয়ায়াত (বর্ণনা) অনুযায়ী কোন বিদ্বানের রায় অনুযায়ী নয়। বলা বাহুল্য কারও তাক্বলীদ করার চেয়ে এই তরীকাই সহজতর *(শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০/১৯২১ খ্রিঃ, ১৫ পৃঃ; তিনটি মতবাদ ১৮ পৃঃ)*।

৭. মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন,

ومن المعلوم أن الله تعالي ما كلف احدا ان يكون حنيفا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا بل كلفهم ان يعلموا السنة–

এটা জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাউকে বাধ্য করেননি এ জন্য যে, সে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী হোক। বরং বাধ্য করেছেন এ জন্য যে, তারা সুন্নাত অনুযায়ী আমল করুক।

৮. ইমাম ত্বাহাবী বলেন, لا يقلد الا عصبي او غبي– গোঁড়া অথবা নির্বোধ ছাড়া কেউ তাক্বলীদ করে না *(ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), অনুবাদ ২৩ পৃঃ)*।

৯. ইবনু আবেদীন ইবনুল হুমামের উস্তাদ ইবনুশ শাহানা আল-কাবীরের شرح الهداية থেকে উদ্ধৃত করেন, 'যখন হাদীছ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়ে যাবে আর তা মাযহাবের বিপক্ষে থাকবে তখন হাদীছের উপরই আমল করা উচিত হবে এবং এটাই তার (ইমামের) মাযহাব বলে বিবেচিত হবে। উক্ত হাদীছের উপর আমল করাটা তাকে বহিস্কার করবে না। কেননা ইমাম আবু হানীফা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এসেছে যে, হাদীছ ছহীহ হ'লে এটাই আমার অনুসৃত পথ বলে জানতে হবে। একথা ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র, ইমাম আবু হানীফাসহ অন্যান্য ইমামদের থেকেও বর্ণনা করেন *(ছিফাতুন নাবী, অনুবাদ ২৪ পৃঃ)*।

১০. ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, ' যে ফক্বীহের তাক্বলীদ করা হয় তাঁরা নিজেরাই তাক্বলীদ খণ্ডন করেছেন। তারা স্বীয় সাথীদেরকে নিজেদেরকে নিজেদের তাক্বলীদ থেকে নিষেধাজ্ঞা শুনিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ ছিলেন কঠিনতম। ছহীহ হাদীছ অনুসরণ ও দলীল দ্বারা অপরিহার্য করে তা গ্রহণের গুরুত্ব তাঁর কাছে যত বেশী ছিল তা অন্যদের কাছে ছিল না। তাঁকে অন্ধ অনুসরণ করার প্রতিও তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি তা ঘোষণাও করেছেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে উপকার করুন এবং তাঁকে বড় ধরনের প্রতিদান দান করুন। তিনি বহু মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসার সোপান ছিলেন *(ছিফাতুন নাবী, অনুবাদ ২৯ পৃঃ)*।

১১. হাফেয ইবনু রজব বলেন, যার কাছেই নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ পৌঁছে যায় এবং তিনি তা বুঝতে পারেন তাহ'লে তার উপর এটাকে উম্মতের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করার আদেশ প্রদান করা ওয়াজিব যদিও উম্মতের বিরাট কোন ব্যক্তিত্বের বিরোধী হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ যেকোন বড় ব্যক্তির মতামত অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও অনুসরণযোগ্য। যিনি (বড় ব্যক্তিত্ব) ভুলবশত কোন কোন ক্ষেত্রে নবীর আদেশের বিরুদ্ধচারণ করেন। এজন্যই ছাহাবগণ ও তৎপরবর্তী লোকেরা ছহীহ হাদীছের বিরুদ্ধচারণকারীদের প্রতিবাদ করেছেন *(ছিফাতুন নাবী (ছাঃ), অনুবাদ ৩৫ পৃঃ)*।

১২. শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী তাক্বলীদ সম্পর্কে চার ইমামের বক্তব্য তুলে ধরার পর বলেন, ... এসবই হ'ল ইমামগণের বক্তব্য যাতে হাদীছের উপর আমল করার ব্যাপার নির্দেশ রয়েছে এবং তাদের তাক্বলীদ করা থেকে নিষেধ রয়েছে। কথাগুলো এতই স্পষ্ট যে, এগুলো কোন তর্ক বা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব যে ব্যক্তি ইমামের কিছু কথার বিরুদ্ধে গেলেও সকল সুসাব্যস্ত হাদীছ আঁকড়ে ধরবেন তিনি ইমামদের মাযহাব বিরোধী হবেন না এবং তাদের ত্বরীকা থেকে বহিস্কৃতও হবেন না বরং তিনি হবেন তাদের প্রত্যেকের অনুসারী। আরো হবেন, শক্ত হাতল মযবুতভাবে ধারণকারী, যে হাতল ছিন্ন হবার নয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধু ইমামদের বিরোধিতার কারণে সুসাব্যস্ত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে তার অবস্থা এমনটি নয় বরং এর মাধ্যমে তাদের অবাধ্য হ'ল এবং তাদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর বিরোধিতা করল *(ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ), অনুবাদ ৩৪ পৃঃ)*। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ' তোমার প্রতিপালকের ক্বসম তারা ঈমানদার হ'তে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিরসনে তোমাকে বিচারক মানবে, অতঃপর তোমার মীমাংসায় নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

উপসংহার :

উপরের আলোচনা হ'তে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিগত কোন ইমাম বা আলেম তাক্বলীদ করতে বলেননি। তাই পরবর্তীকালে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী ফের্কাবন্দীর জন্য তারা দায়ী নন বরং দায়ী মুক্বাল্লিদগণ নিজেই। যেমন ঈসা (আঃ)-কে ইলাহ বানানোর জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। দায়ী ছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর কিছুসংখ্যক তথাকথিত ভক্তের দল। তাই সর্বাবস্থায় তাক্বলীদ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

[কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অবক্ষয় যুগ

(৩৭৫-১১১৪/৯৮৪-১৭০৩ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় সোয়া সাতশো বছর)

৩৭৫ হিজরীতে ভূপর্যটক মাকদেসী যখন সিন্ধু ভ্রমণে আসেন, তখন সেখানে আহলেহাদীছের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শাসনকর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ করেন।[৭] সেখান হ'তে পরবর্তী ৩৯২ হিজরীর মধ্যে যেকোন এক সময়ে মুলতান ও মানছূরার শাসন ক্ষমতা ইসমাঈলী শী'আদের হাতে চলে যায়। ফলে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সাথে সাথে সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পট-পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। শী'আরা সুন্নীদের উপরে নিষ্ঠুর আচরণ শুরু করে।[৮] মুলতানের জামে মসজিদ বন্ধ করে দেয়। মাদরাসাগুলি ধ্বংস করা হয়। মুহাদ্দিছগণকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। হাদীছ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করা হয়। দেবল ও মানছূরার হাদীছশিক্ষার কেন্দ্রগুলি স্তিমিত হয়ে পড়ে। হিন্দু হতে ধর্মান্তরিত।[৯] স্থানীয় সামূরা (SAMURA) বা সূমরূ (سومرو) ইসমাঈলী শী'আ গোত্রটি ছিল এ ব্যাপারে খুবই তৎপর ও শক্তিশালী। তাদের প্রচন্ড সুন্নী-বিদ্বেষের ফলে সিন্ধু অঞ্চলে আরবগণ গঠনমূলক যা কিছু করেছিলেন প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। ৩৯২ হিজরী মোতাবেক ১০০০ খৃষ্টাব্দে গযনীর সুলতান মাহমূদ বিন সবুক্তগীন (৩৮৮-৪২১/৯৯৭-১০৩০ খৃঃ) স্থলপথে হিন্দুস্থান বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে লাহোরকে রাজধানী করে পাঞ্জাব ও সিন্ধু এলাকায় স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও সুমরূ শী'আদের গোপন দৌরাত্ম ঠিকই বজায় ছিল।[১০] পরবর্তীতে ঘোরী, মামলূক, খাল্জী ও তুগলক সালতানাতের সময়েও তাদের এই সুন্নীবিদ্বেষ বজায় থাকে।[১১] তাছাড়া সুলতান মাহমূদ ইলমে হাদীছের প্রতি যতটুকু দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তী সুলতানগণ তা দেননি।[১২] এই ভাবে ইল্‌মে হাদীছের প্রসার ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সৃষ্ট অবক্ষয় যুগ দীর্ঘায়িত হতে থাকে। এই ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুদারতার মধ্য দিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলন নিবু নিবু ভাবে হ'লেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন মুহাদ্দিছ ও ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে চলতে থাকে। সে হিসাবে আমরা অবক্ষয় যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে তিনটি প্রধান এলাকায় বিভক্ত করতে পারি। ১-উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় এলাকা ২- দক্ষিণ ভারতীয় এলাকা এবং ৩- উত্তর ও পূর্ব ভারতীয় এলাকা। এক্ষণে আমরা এইসব এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহের ও সেখানকার মুহাদ্দিছগণের পরিচয় তুলে ধরব।

৩- উত্তর ও পূর্ব ভারতীয় এলাকা। এক্ষণে আমরা এইসব এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহের ও সেখানকার মুহাদ্দিছগণের পরিচয় তুরে ধরব।

(১) উত্তর-পশ্চিম ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলন

সুলতান মাহমূদের সময়কাল (৩৯২-৪২১/১০০০-১০৩০ খৃঃ) বাদে পঞ্চম শতাব্দী হিজরীর প্রথমার্ধ হতে দশম শতাব্দী হিজরীতে মাখদূম আব্দুল আযীয আবহারীর (মৃঃ ৯২৮/১৫২১ খৃঃ) সময়কাল[১৩] পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশো বছর যাবৎ উত্তর-পশ্চিম ভারত তথা সিন্ধু, পাঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত এলাকায় ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্রগুলির সাথে সিন্ধুর ইল্‌মী যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।[১৪] তবুও এই সময় কিছু কিছু আহলেহাদীছ বিদ্বান বিভিন্ন সময়ে ইল্‌মে হাদীছের খিদমত করেছেন ও মানুষকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহবান জানিয়ে গেছেন। নিম্নে এযুগের কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

১- ইসমাঈল লাহোরী (মৃঃ ৪৪৮/১০৫৬ খৃঃ)ঃ[১৫] কুরআন ও হাদীছে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এই খ্যাতনামা আলিম ৩৯৮/১০০৬ খৃষ্টাব্দে বুখারা হতে লাহোর আসেন এবং ইল্‌মে হাদীছের চর্চা শুরু করেন। তাঁর ওয়াযের এমন প্রভাব ছিল যে, লাহোরের বহু অমুসলিম বাশিন্দা ইসলাম গ্রহণ করেন। লাহোর শহরের বহু মুসলমান হাদীছ অনুযায়ী জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হন। ৪১২/১০২১ খৃষ্টাব্দে লাহোর জয় করে[১৬] হাদীছভক্ত সুলতান মাহমূদ পাঞ্জাবের শী'আ প্রভাবিত অন্যান্য শহরকে বাদ দিয়ে হাদীছ প্রভাবিত লাহোরকে উত্তর ভারতের রাজধানী হিসাবে মানোনীত করার পিছনে মুহাদ্দিছ ইসমাঈলের প্রভাব একটি কারণ হিসাবে ধারণা করা যেতে পারে।

২- আলী বিন আমর বিনুল হাকাম লাহোরী (মৃঃ ৫২৯/১১৩৪ খৃঃ)ঃ ইনি খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। হাদীছজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বিখ্যাত সংকলক সমরকন্দের মুহাদ্দিছ সাম'আনীকে তাঁর ছাত্রদলের মধ্যে গণ্য করা যায়।[১৭]

---

৭. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী মাকদেসী প্রণীত ভ্রমণ গ্রন্থ 'আহসানুত তাক্বাসীম' (লন্ডনঃ ই, জে, ব্রীল, ২য় সংস্করণ ১৯০৬) পৃঃ ৪৮১।

৮. Dr. Muhammad Ishque, INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (Dacca University, 2nd ed. 1976) p. 42.

৯. ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শী, উর্দূ অনুবাদঃ হেলাল আহমাদ যোবায়রী, 'বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কি মিল্লাতে ইসলামিয়াহ' (করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ ১৯৬৭) পৃঃ ৫১।

১০. শাহেদ হুসাইন রায্‌যাক্বী, ইল্‌মে হাদীছ মেঁ বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ কা হিছ্‌ছা' (লাহোরঃ ইদারা ছাক্বাফাতি ইসলামিয়াহ, ১৯৭৭খৃঃ) পৃঃ ৬১-৬৩।

১১. সমরূগণ ১৪শ খৃষ্টাব্দে এসে 'সুন্নী' হয়ে যায়।-'বার্রে আযীম পাক ও হিন্দ' পৃঃ ৫৩।

১২. সুলতান মাহমূদ (মৃঃ ৪২১/১০৩০ খৃঃ) একজন উঁচুদরের হানাফী আলিম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আত্-তাফরীদ' হানাফী ফিক্‌হের একটি উলেস্নখযোগ্য গ্রন্থ (আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, 'জুহুদ মুখ্‌লিছাহ' পৃঃ ৩১-৩২)। একদা নিজ দরবারে ইমাম ক্বাফ্‌ফাল মারওয়াযীর নিকটে তিনি হানাফী ও শাফেঈ উভয় মাযহাবের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন এবং ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রমানিত হওয়ায় তিনি সংগে সংগে 'শাফেঈ' মাযহাব গ্রহণ করেন।- আহমাদ ইবনু খাল্লিকান (৬০৮-৬৮১/১২১২-১২৮৩), 'অফইয়াতুল আ'ইয়ান' (মিসরঃ মায়মানিয়াহ প্রেস ১৩১০/১৮৯২ খৃঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৬; তাজুদ্দীন সুব্‌কী, 'তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ অফসেট ছাপা, মূল মুদ্রণকাল ১৩২৪/১৯০৬, ২য় সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৪)। ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ঐতিহাসিক মোল্লা মুহাম্মাদ কাসিম হিন্দুশাহ ঈরানী ওরফে ফিরিশ্‌তা (৯৭৮-১০২১/১৫৭০-১৬১২ খৃঃ) সুলতান মাহমূদকে 'আহলেহাদীছ' বিদ্বানদের মধ্যে গণ্য করেছেন।- তারীখে ফিরিশতা (কানপুর, ভারতঃ নওলকিশোর ছাপা ১৩০১/১৮৮৩ খৃঃ) ১ম মাক্বালাহ, ১ম খ- পৃঃ ২৩।

১৩. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৩২।

১৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৩।

১৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭১; কাযী আতহার মুবারকপুরী মুহাদ্দিছ ইসাঈল লাহোরীর মৃত্যুসন ৪০৮ হিজরী বলেছেন।-রিজালুস সিন্দ পৃঃ ৭৭।

১৬. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ৯৯।

১৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৩।

৩- আবদুছ ছামাদ লাহোরী ঃ ইনি মুহাদ্দিছ আলী বিন আমর লাহোরীর ছাত্র ছিলেন। সমরকন্দে গিয়ে সাম'আনীর নিকটেও হাদীছ শিক্ষা করেন।[১৮]

৪- হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান ছাগানী লাহোরী (৫৭৭-৬৫০/১১৮১-১২৫২ খৃঃ)ঃ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর বংশধর রাযিউদ্দীন হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী লাহোরী উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি বাগদাদ, ইয়ামন, হিজায প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের নিকটে ইল্‌মে হাদীছে বুৎপত্তি লাভ করেন।[১৯] বুখারী ও মুসলিম হতে সংকলিত

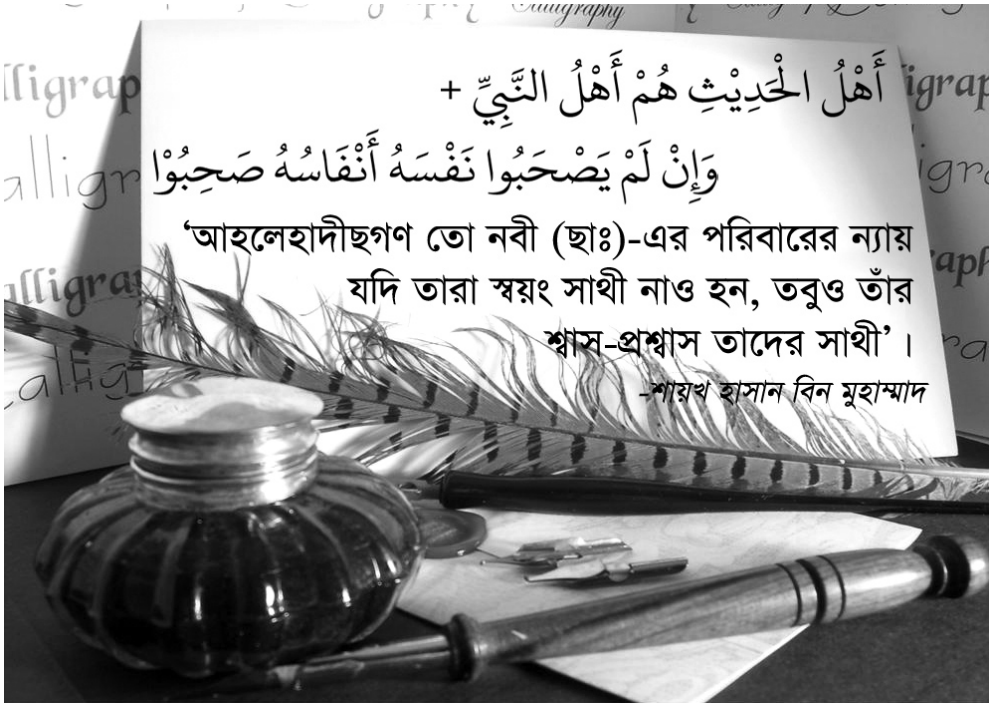

কওলী হাদীছের গ্রন্থ 'মাশারেকুল আনওয়ার' তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এন দেয়। অনাবশ্যক মাসায়েলী বিতর্ক থেকে দূরে ছহীহ হাদীছ অনুযাযী জীবন পরিচালনার জন্য এবং হাদীছকে জনগণের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়ার জন্য তিনি এই কঠিন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন।[২০] এমনিভাবে কেউ যাতে মওযূ হাদীছ অনুসরণ না করে সেজন্য 'আল-মাওযূআত' নামে তিনি একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন।[২১] ফেক্‌হী বিষয় ভিত্তিক সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ 'মাশারেকুল আনওয়ার'-কে মুহাদ্দিছ খুররম আলী বালহারী (মৃঃ ১২৬০ হিঃ) এমন একটি ফুলবাগিচার সাথে তুলনা করেছেন, যার রং এক কিন্তু সুগন্ধি পৃথক পৃথক।[২২] ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন- 'তৎকালীন সময়ে ফিক্‌হের জালে আবদ্ধ হিন্দুস্থান ও মধ্য এশিয়ায় এই কিতাবখানিই মাত্র ইল্‌মে হাদীছের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল।'[২৩]

(২) দক্ষিণ ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলন

দক্ষিণ ভারতীয় আন্দোলনকে দক্ষিণাত্যে বাহমনী যুগ ও গুজরাটে মুযাফ্‌ফর শাহী যুগ দু'ভাগে ভাগ করা চলে।

ক-বাহমনী যুগ (৭৮০-৮৮৬ হিঃ/১৩৭৮-১৪৭২ খৃঃ)

অনেক পণ্ডিত এই যুগটিকে ভারতবর্ষে ইল্‌মে হাদীছের 'নবজন্ম লাভের যুগ' বলেছেন।[২৪] বাহমনী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ শাহ (৭৮০-৭৯৯/১৩৭৮-১৩৯৭ খৃঃ) ইল্‌মে হাদীছের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। হেজায ও মিসর হতে দাক্ষিণাত্যে অগণিত মুহাদ্দিছের আগমন ঘটে। ফলে গুলবর্গা, বেদার, দৌলতাবাদ, ইলিচপুর, চৌল, যাবিল প্রভৃতি শহর গুলি ইল্‌মে হাদীছের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[২৫] ২য় মুহাম্মাদ শাহের পর থেকে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারীদের সময়ে ও বিশেষ করে সুলতান ২য় আলাউদ্দীনের (৮৩৮-৮৬২/১৪৩৪-৫৮) সময়ে ইরান হ'তে আগমন করেন ইল্‌মে হাদীছে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও পরবর্তীতে দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ বাহমনী সালতানাতের খ্যাতনামা উযীর ও প্রধানমন্ত্রী মাহমূদ গাওয়ান (৮১৩-৮৮৬/১৪১০-১৪৮২ খৃঃ)। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আরব বিশ্ব হ'তে বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ দক্ষিণ ভারতে আগমন করেন। তিনি হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৮ খৃঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি রাজধানী বিদরে একটি বৃহদায়তন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজস্ব কুতুবখানার তিনি হাজার কিতাব ছাড়াও অন্যান্য সূত্র হ'তে ৩৫,০০০ হাজার কিতাব সংগ্রহ করে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করেন।[২৬] কিন্তু অবশেষে তিনি সুলতান ৩য় মুহাম্মাদ শাহ (৮৬৭-৮৮৬/১৪৬৩-৮২ খৃঃ) কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।[২৭] তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে শুধু বাহমনী রাজ্যেরই পতন শুরু হয়নি বরং দাক্ষিণাত্যে ইল্‌মে হাদীছের প্রসার ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতি মন্থর হয়ে যায়। একটি যুগের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারতে শী'আ অধিকার কায়েম হয় ও সেখানে সিন্ধুর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু হয়।

---

১৮. 'রিজালুস সিন্দ' পৃঃ ১৬৫।
১৯. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহুদ মখ্‌লিছাহ পৃঃ ৩৩-৩৪, রিজালুস সিন্দ পৃঃ ৯৪।
২০. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ২৫৭-৬৯।
২১. 'জুহুদ মুখলিছাহ' পৃঃ ৩৪।
২২. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ২৬৭।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮ ['Suffice it to say that it was the `Mashariq ai Anwar' which kept aloft the banner of the sunnah in the fiqh-ridden country of India and central Asis of the day; INDI'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE. pp.230]
২৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮; জুহুদ মুখলিছাহ পৃঃ ৩৭।
২৫. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১২৬।
২৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৬-১১৭।
২৭. ডঃ সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, 'ভারতবর্ষের ইতহাস-মুসলিম ও বৃটিশ শাসন' (ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ৪০ নর্থব্রুক হল রোড, ৩য় সংস্করণ পূণর্মুদ্রণ জুন ১৯৮৪)পৃঃ ২১৯।

খ- মুযাফ্ফর শাহী যুগ (৮৬৩-৯৮০/১৪৫৮-১৫৭২ খৃঃ)

দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্যে শী'আ অধিকার কায়েম হবার ফলে সেখানে আহলেহাদীছ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। সেখানকার মুহাদ্দিছগণ পার্শ্ববর্তী গুজরাট রাজ্যের হাদীছভক্ত সুলতান আবুল ফৎহ খান ওরফে মাহমূদ বেগরহা (৮৬৩-৯১৭/১৪৫৮-১৫১১ খৃঃ) এর উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে সেখানে আশ্রয় নিতে থাকেন। সুলতানের গুণগ্রাহিতার সুবাদে ইতিপূর্বেই সেখানে আরব বিশ্ব হতে বহু খ্যাতিমান মুহাদ্দিছের আগমন ঘটেছিল। মিসরের মুহাদ্দিছ অজীহুদ্দীন মুহাম্মাদ (৮৫৬-৯১৯/১৪৫২-১৫১৩ খৃঃ)-কে সুলতান মাহমূদ বেগরহা মালিকুল মুহাদ্দেছীন' খেতাবসহ মহামূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে গুজরাটে আনেন ও রাজ্যের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করেন। ৯১৮/১৫১২ খৃষ্টাব্দে যখন ইয়ামন হ'তে ফাৎহুল বারীর হস্তলিখিত কপি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসে[২৮] এবং সুলতান মুযাফ্ফর শাহ (৯১৭-৩২/১৫১১-২৫ খৃঃ)-কে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তখন তিনি এতই খুশী হয়েছিলেন যে, হাদিয়া দাতাকে সমৃদ্ধ বন্দরনগরী 'ভ্রুচ' জায়গীর স্বরূপ দান করেন।[২৯]

মুযাফ্ফর শাহী সুলতানগণ ইল্‌মে হাদীছকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাপক অনুবাদ ও সংকলনের ব্যবস্থা করেন। সূলতান ৩য় মাহমূদ (৯৪৪-৬১/১৫৩৭-৫৩ খৃঃ) নিজ খরচে মক্কাতে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। তিনি 'কানযুল উম্মাল' সংকলক শায়খ আলী মুত্তাক্বী জৌনপুরী (মৃঃ ৯৭৫/১৫৬৮ খৃঃ) ও শায়খ আব্দুল্লাহ সিন্ধী (৯৯৩/১৫৮৪ খৃঃ)-এর জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণকে গুজরাটে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। বাহমনী উযীর মাহমূদ গাওয়ান (৮১৩-৮৬/১৪১০-৮২ খৃঃ)- এর ন্যায় তিনিও ভাগ্যক্রমে আছফ খান নামে এক গুণবান উযীরের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু ৯৬১ হিজরীতে তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর গুজরাটে চরম অরাজকতা শুরু হয়ে যায়।[৩০] অবশেষে ৯৮১/১৫৭২ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের (৯৬৩-১০১৪/১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) হতে মুযাফ্ফরশাহী সালতানাতের পতন ঘটে।[৩১] এইভাবে অবক্ষয় যুগে দক্ষিণ ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আরেকটি প্রধান কেন্দ্রের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

দক্ষিণ ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মুহাদ্দিছগণের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা চলে। যেমন- (১) শায়খ ইয়াকুব বিন আব্দুর রহমান হাশেমী (৭৪৯-৮৪৩/১৩৮৭-১৪৩৯ খৃঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণকারী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৮ খৃঃ)- এর ছাত্র এই মুহাদ্দিছ ৮৩০ হিজরীতে গুজরাটের খাম্বাইতে আসেন ও ৮৪৩ হিজরীতে দক্ষিণ বেরারে ইন্তেকাল করেন।[৩২] (২) মাহমূদ গাওয়ান (৮১৩-৮৮৬/১৪১০-১৪৮২ খৃঃ) ইরানের এই ক্ষণজন্মা মনীষী কায়রোতে গিয়ে ইবনু হাজার আসকালানীর নিকটে ছহীহ বুখারী এবং যয়নুদ্দীন যরকেশী (মৃঃ ৮৪৫/১৪৪১ খৃঃ)-এর নিকটে ছহীহ মুসলিম এবং সিরিয়া গমন করে সেখানকার মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষা করেন ও পরবর্তীতে বাহমনী উযীর হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।[৩৩] (৩) আব্দুল আযীয বিন মাহমূদ তূসী (৮৩৬-৯১০/১৪৩২-১৫১৪ খৃঃ)ঃ ইনিও ইরানের অধিবাসী ছিলেন। ইবনু হাজারের ছাত্র মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আবহারীর শিষ্য ছিলেন। পরে মক্কায় গিয়ে হাফেয আব্দুর রহমান সাখাবী (মৃঃ ৯০২ হিঃ/১৪৯৬ খৃঃ)-এর নিকটে ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষা করেন। মাহমূদ গাওয়ানের পুত্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন।[৩৪] (৪) ওমর বিন মুহাম্মাদ দামেস্কী (৮২৯-৯০০/১৪২৫-৯৪ খৃঃ)ঃ ইনিও হাফেয সাখাবীর ছাত্র ছিলেন। গুজরাটের খাম্বাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।[৩৫] (৫) অজীহুদ্দীন মুহাম্মাদ মালেকী মিসরী (৮৫৬-৯১৯/১৪৫২-১৫১৩ খৃঃ) (৬) জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ওমর হাযরামী (৮৬৯-৯৩০/১৪৬৪-১৫২৪ খৃঃ) হাযরামাউতের অধিবাসী। (৭) হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ কিরমানী (মৃঃ ৯৩২/১৫২৫ খৃঃ) মক্কার অধিবাসী (৮) রফীউদ্দীন সিরাযী সাফাবী (মৃঃ ৯৫৪/১৫৪৭ খৃঃ) ইরানের অধিবাসী (৯) আব্দুল মু'তী বিন হাসান হাযরামী (৯০৫-৮৯/১৪৯৯-১৫৮১ খৃঃ) মক্কার অধিবাসী (১০) শিহাবুদ্দীন আহমাদ আবাসী মিসরী (৯০৩-৯২/১৪৯৭-১৫৮৪ খৃঃ) (১১) আব্দুল্লাহ ঈদরূসী (৯১৯-৯০/১৫১৩-৮২) হাযারামাউতের অধিবাসী (১২) সাঈদ বিন আবু সাঈদ হাবাশী (মৃঃ ৯৯১/১৫৮৩ খৃঃ) (১৩) মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ফাকেহী হাম্বলী (মৃঃ ৯৯২-১৫৮৪ খৃঃ)। এঁরা দু'জনই মক্কায় ইবনু হাজার হায়ছামী (৯০৯-৯৭৪/১৫০৩-১৫৬৭ খৃঃ)-এর ছাত্র ছিলেন।

উপরের মুহাদ্দিছগণের সকলেই ছিলেন বিদেশী এবং যুগের চারজন সেরা মুহাদ্দিছ ইবনু হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২/১৩৭২-১৪৪৮ খৃঃ), যয়নুদ্দীন যাকারিয়া আনছারী (৮২৬-৯২৫/১৪২৩-১৫১৯ খৃঃ), আব্দুর রহমান সাখাবী (মৃঃ ৯০২-১৪৯৬ খৃঃ) ও ইবনু হাজার হায়ছামী (৯০৯-৯৭৪/১৫০৩-১৫৬৭ খৃঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। প্রথমোক্ত দু'জনের নেতৃত্বে মিসরে ও শেষোক্ত দু'জনের নেতৃত্বে মক্কাতে ইল্‌মে হাদীছের মারকায কায়েম হয়।[৩৬] এক্ষণে আমরা দক্ষিণ ভারতের স্বদেশী মুহাদ্দিছবৃন্দের নাম উল্লেখ করব, যাঁরা এতদঞ্চলে ইল্‌মে হাদীছের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন-

(১) রাজিহ বিন দাঊদ গুজরাটি (মৃঃ ৯০৪/১৪৯৬ খৃঃ) (২) কুতুবুদ্দীন আববাসী গুজরাটি (৩) আব্দুল মালিক আববাসী গুজরাটি (মৃঃ ৯৭০/১৫৬৩ খৃঃ) (৪) আব্দুল আউয়াল হুসাইনী জৌনপুরী (মৃঃ ৯৬৮/১৫৬১ খৃঃ) (৫) শায়খ ত্বাইয়িব সিন্ধী (মৃঃ ৯৯৯/১৫৯০ খৃঃ) (৬) ত্বাহির বিন ইউসুফ সিন্ধী (মৃঃ ১০০৪/১৫৯৫ খৃঃ) (৭) অজীহুদ্দীন আলুবী গুজরাটি (৯১০-৯৯৮/১৫০৪-১৫৯০) (৮) আবু বকর বিন মুহাম্মাদ ভ্রুচী গুজরাটি (মৃঃ ৯১৫/১৫০৯) (৯) উছমান বিন ঈসা সিন্ধী (মৃঃ ১০০৮/১৬০০ খৃঃ) (১০) 'কানযুল উম্মাল' সংকলয়িতা শায়খ আলী বিন হুসামুদ্দীন ওরফে আলী মুত্তাক্বী জৌনপুরী (৮৮৫-৯৭৫/১৪৮১-১৫৬৮ খৃঃ) ও তাঁর স্বনামধন্য ছাত্রমণ্ডলী যেমন- (১১) শায়খ জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ত্বাহির ওরফে ত্বাহির পাট্টানী গুজরাটি (৯১৪-৯৮৬/১৫০৮-১৫৭৮ খৃঃ) (১২) কাযী আবদুল্লাহ বিন ইদরীস সিন্ধী (মৃঃ ৯৫৫/১৫৪৮ খৃঃ) (১৩) রহমাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ সিন্ধী (মৃঃ ৯৯৩-১৫৮৫ খৃঃ) (১৪) শায়খ হামীদ বিন আবদুল্লাহ সিন্ধী (১৫) আবদুল হক দেহলভীর উস্তাদ শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব বিন ওয়ালিউল্লাহ বুরহানপুরী (৯৪৩-১০০১/১৫৩৬-৯২ খৃঃ) (১৬) শাহ মুহাম্মাদ বিন ফযলুল্লাহ গুজরাটি (মৃঃ ১০০৫/১৫৯৬ খৃঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেছীনে কেরাম। এই সকল সেরা মুহাদ্দিছের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতে প্রায় দুইশত বৎসর (৭৮০-৯৮০/১৩৭৮-১৫৭২ খৃঃ) পর্যন্ত আহলেহাদীছ আন্দোলন ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের তুলনায় বেশী ছিল বলা চলে।[৩৭]

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃঃ ২২৩-২২৯)।

---

২৮. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১৩০।
২৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৯।
৩০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০-৩১।
৩১. 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পৃঃ ২১৫।
৩২. 'জুহুদ মুখলিছাহ' পৃঃ ৪০; 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১১৫।
৩৩. 'ইল্‌মে হাদীছ' পৃঃ ১১৬-১১৭।
৩৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৮।
৩৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৮।
৩৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১২।
৩৭. এ বিষয়ে সমস্ত আলোচনার জন্য ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক -এর পি,এইচ-ডি থিসিস INDIAN'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH LITERATURE (Dacca Univerisity 2nd Ed. 1976; আবদুর রহমান ফিরিওয়াঈ, 'জুহুদ মুখ্‌লিছাহ' (বেনারসঃ মাতবা'আ সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬; সুলায়মান নাদ্‌ভী (১৮৮৪-১৯৫৩ খৃঃ) আযমগড় (ইউ,পি, ভারত)ঃ 'মা'আরিফ' গবেষণা পত্রিকা ২২শ বর্ষ ৪ ও ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ 'হিন্দুস্তান মেঁ ইল্‌মে হাদীছ' দ্রষ্টব্য।

নাস্তিক্যবাদ ও হেফাজতে ইসলাম প্রসঙ্গ

বাংলার আকাশে পরাধীনতার কালো মেঘ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এমনিতেই আসেনি। বরং হাজারো মানুষের খুনরাঙ্গা পথ বেয়ে, শত মা ও বোনের অশ্রুসিক্ত পথ মাড়িয়ে এসেছে এই স্বাধীনতা। ইতিহাস যার সাক্ষী। কিন্তু কথায় আছে স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে তাকে রক্ষা করা বেশী কঠিন। আজ মনে হয় আমরা বাংলাদেশী মুসলমানরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার এই কঠিন যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি। দেশের আকাশে আজ আনগোনা করছে পরাধীনতার কালো মেঘ, যা দেশের দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে অজানা নয়। ২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পিলখানায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বদ্ধপরিকর এদেশের সেনাবাহিনীর উপর চালানো গণহত্যার পরই বিষয়টি চিন্তাশীল মহলের নজরে পড়ে এবং গত ৫ মে দিবাগত রাত ২.৩০-এর দিকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রাণভোমরা ইসলামপ্রিয় জনতার উপর চালানো নৃশংস গণহত্যা এই সন্দেহকে আরো ঘণীভূত করেছে। দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে এসে বক্ষমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাস্তিকদের উত্থান : নাস্তিকতা অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা। যাকে ইংরেজীতে Atheism বলে। Oxford dictionery-তে এর অর্থ বলা আছে The belief that God does not exist। অনেকেই কমিনিজম আর নাস্তিক্যতাবাদকে গুলিয়ে ফেলেন যা আসলে ভুল। ইউরোপ ও এশিয়ায় দার্শনিক আলোচনায় এই তত্ত্বের উৎপত্তিকাল যদিও খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ধারণা করা হয়, কিন্তু পশ্চিমে আধুনিককালে আঠারো শতকেই এর সর্বাধিক বিস্তারলাভ ঘটেছে। সমাজবিজ্ঞানের অনেক পণ্ডিত ধারণা করেন যে, প্রধানত মূর্তিপূজার বিরুদ্ধেই নাস্তিকতাবাদের উৎপত্তি। এই মতবাদে বিশ্বাসী নাস্তিকদের সংখ্যা সারা পৃথিবীর মূল জনসংখ্যার শত ভাগের এক ভাগও নয়। সব ধর্মের আস্তিকরা এদের ঘৃণা করে। আমাদের দেশে নাস্তিকদের উত্থান শুরু হয় গত ৭/৮ বছর আগে থেকে। এই দেশের নাস্তিকরা অন্য ধর্মকে অস্বীকার করুক বা না করুক তাদের মূল টার্গেট ইসলাম। তারা ইন্টারনেটের ব্লগ সাইটগুলোকে তাদের মিশন পরিচালনার মূল অভয়ারণ্যে পরিণত করে। আর জনগণের চোখের আড়ালে নাস্তিক্যবাদের ভয়ংকর বিষ ছড়াতে থাকে। যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রাণপ্রিয় ধর্ম ও তার নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে নিয়ে তাদের জঘন্যতম অশ্লীল বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী'১৩ আততায়ীদের হাতে নাস্তিক রাজিব হায়দারের নিহত হওয়ার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে সব অজানা ভয়ংকর তথ্য। যা ১৭ ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইনকিলাবে এবং ১৮ ফেব্রুয়ারী দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় 'ভয়ংকর ইসলামবিদ্বেষী ব্লগার চক্র' এবং ঐ একই পত্রিকায় ২০ ফেব্রুয়ারী 'ব্লগে নাস্তিকতার নামে কুৎসিত অসভ্যতা' শিরোনামে প্রকাশ পায়। সাথে সাথে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে। এরই সূত্র ধরে সচল হয়ে উঠে হেফাজতে ইসলাম এবং ১৯ ফেব্রুয়ারীতে ঐ পত্রিকাতে দেশবাসী ও সরকারের প্রতি আল্লামা আহমাদ শফির খোলা চিঠি প্রকাশ করা হয়।

ব্লগের নাস্তিকদের অপকর্ম সম্পর্কে ধারণা পেতে দু'একটি উদাহরণ দেয়া হল। যেমন– তারা রাসূল (ছাঃ) কে 'মোহাম্মক' (মহা+আহম্মক) বলে এবং তার খতমে নবুওতের মোহরকে খাদীজা (রাঃ) এর পায়ের জুতার হিল বলে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দেয়। তারা কুরআনের আয়াতকে নিয়ে যথেচ্ছ ব্যঙ্গ প্যারোডী রচনা করে এবং কুরআনকে বাজেয়াপ্ত করার দাবী জানায়। হাদীছকে হা-হা হাদীছ বলে টিটকারী করে। রাসূল (ছ:)-এর ব্যক্তিজীবন নিয়ে জঘন্য কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা লেখে।

ব্লগের এসকল নাস্তিকদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত আসিফ মহিউদ্দীন মসজিদ সম্পর্কে ঢাকা শহরের সব মসজিদকে পাবলিক টয়লেট বানানো উচিত *(নাউযুবিল্লাহ)*। সে সিজদা সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে লেখে মোহাম্মক তাহার ইয়ারদোস্ত লইয়া প্রায়শই কাবা প্রাঙ্গণে আরবি (মদ) খাইয়া পড়িয়া থাকিত *(নাউযুবিল্লাহ)*। প্রথম আলো পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক আনিসুল হকের 'ছহি রাজাকারনামা' শিরোনামে তার একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতকে সম্পূর্ণ বিদ্রুপাত্মক ভাষায় লিখেছে। বইটিতে পর্দানশিন নারী ও দাড়ি-টুপিধারী আলেমদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছে শিশির ভট্টাচার্য। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে আওয়ামীপন্থী সাংবাদিক, একাত্তর টিভির ব্যস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল বাবু ও সাবেক ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকুকে। 'সচলায়তন' ব্লগে শাহবাগ আন্দোলনের পক্ষে লেখাটি পুনঃপ্রকাশ করা হয়। পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 'সমস্ত প্রশংসা জগতের প্রতিপালক আল্লাহর'। আনিসুল হক তার 'সহি রাজাকারনামা'য় এই আয়াতের প্যারোডি লিখেছে, 'সমস্ত প্রশংসা রাজাকারগণের'। সূরা ফাতেহার আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আনিসুল হক ব্যঙ্গ ও বিকৃত করে লিখেছে, 'আর তোমরা রাজাকারের প্রশংসা করো, আর রাজাকারদের সাহায্য প্রার্থনা করো'।

এরকম হাজারো নমুনা জঘন্য ও নিকৃষ্টতম কথাবার্তার নমুনা এখনও ব্লগ ও ফেসবুক জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ইসলামবিদ্বেষী ব্লগগুলো হচ্ছে *সামহোয়্যার ইন ব্লগ, আমার ব্লগ, মুক্তমনা ব্লগ, নাগরিক ব্লগ, ধর্মকারী ব্লগ, নবযুগ ব্লগ, সচলায়তন ব্লগ, চুতরাপাতা ব্লগ, মতিকণ্ঠ* ইত্যাদি। এ ব্লগ সাইটগুলোর অধিকাংশই পরিকল্পিতভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি। *সামহোয়্যার ইন ব্লগ*সহ অন্যান্য ব্লগের মূল কাজই হচ্ছে পবিত্র ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো। এই সমস্ত ব্লগারদের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে আসিফ মহিউদ্দিন। পবিত্র ইসলাম সম্পর্কে মিডিয়ায় বিদ্বেষ, অপপ্রচার, অপবাদ, কুৎসা রটনা এবং অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ অশালীন ভাষায় কটূক্তিকারী সর্বাপেক্ষা সমালোচিত ব্লগ সাইট *'ধর্মকারী'*র অন্যতম লেখক এই আসিফ মহিউদ্দিন। নাস্তিকবান্ধব প্রায় সব ব্লগেই তার সক্রিয়তা থাকলেও সে *সামহোয়্যার ইন ব্লগ* এবং *ফেসবুকে* সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। এ ছাড়া বাংলাদেশকে একটি সমকামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য *'মুক্তমনা'* ও *'সামহোয়্যার ইন ব্লগে'* সে বেশ কিছু পোস্ট করেছিল, যা এখনও রয়েছে। ধারণা করা হয়, কুখ্যাত নাস্তিক আসিফের ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের প্রথম সামাজিক ব্লগ *'স্যামহায়ার ইন ব্লগ'*-এর মালিক দম্পতি সব সময় ইন্ধন জুগিয়েছে। ইহুদী অর্থায়নে পরিচালিত জার্মান সংবাদ সংস্থা *ডয়েচেভেলে*র ২০১২ সালের আন্তর্জাতিক ব্লগার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ব্লগারের পুরস্কার পায় বাংলাদেশের কুখ্যাত নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দিন। ধারণা করা হয় তার এ পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখেন *'সামহোয়্যার ইন ব্লগে'*র কর্তৃপক্ষ দম্পতি।

অপর একটি ব্লগ *'আমার ব্লগ'*-এর মালিক হল সুশান্ত দাস গুপ্ত। ইসলামের বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো অশ্লীল লেখা প্রকাশ করে আসছে এ

ব্লগটি। সিলেটে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের বিরুদ্ধে ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মূর্তি স্থাপনের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয় এ ব্লগটি। এ ব্লগেই মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয়। এই সমস্ত ব্লগারদের পদচারণা এতদিন নেটজগতেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু যখন বাংলাদেশের বিচার বিভাগ জামাআতে ইসলামীর নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় তখন তারা তাঁর ফাঁসির দাবিতে *'ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট ফোরাম'* নামের একটি সংগঠনের ব্যানার খাড়া করে গত ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে রাজধানীর শাহবাগে কথিত 'শাহবাগ চত্বর' ওরফে 'প্রজন্ম চত্বর' ওরফে 'গণজাগরণ মঞ্চ' নাম দিয়ে অবস্থান শুরু করে। এদের আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভারতেরও সমর্থনও মিলতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের একসময়ের জনপ্রিয় সাময়িকী '*দেশ*' শাহবাগীদের বন্দনায় মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। 'জয় বাংলা' শিরোনামে সংবাদপত্রটির গত ১৭ মার্চ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে শাহবাগীদের বন্দনা করা হয়। একই সংখ্যায় সম্পাদকীয়তেও শাহবাগীদের আন্দোলনকে মহিমান্বিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে দেশটির সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক *'টাইমস অব ইন্ডিয়া'*তে *Protesters at Shahbagin bangladesh backed by India*– শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে শাহবাগ আন্দোলন ভারতের মদদপুষ্ট বলে জানিয়েছে (The Times of India, ২৬.২.২০১৩)। ভারতের বিখ্যাত লেখক কুলদিপ নায়ার শাহবাগীদের প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি সেখানে এই আন্দোলনকে 'বাংলাদেশীদের মূল ধারায় ফিরে যাওয়ার আন্দোলন' বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে রাজীব হত্যার পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৪ দলের পদযাত্রা কর্মসূচি পালনকালে টঙ্গীতে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'ব্লগার রাজীব হায়দার দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ'।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার বাসায় গিয়ে সমবেদনা জানান এবং শাহবাগীদেরকে ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তুলনা করেন। হায় আফসোস! কোথায় ক্ষুর্ধাত, হতদরিদ্র মুক্তিযাদ্ধারা, আর কোথায় পোলাও-বিরিয়ানী খাওয়া ইসলামের ভয়ংকর শত্রুরা!

এই শাহবাগীদের পৃষ্ঠপোষকতায় আছে বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক কল্পকাহিনী লেখক জাফর ইকবাল, ইসলাম ও দেশবিরোধী চলচিত্র নির্মাতা শাহরিয়ার কবির, ফতোয়া নিষিদ্ধের রায়প্রদান করা বিচারক গোলাম রব্বানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পাঁড় বামপন্থী মুনতাসির মামুনের মত সঘোষিত নাস্তিকরা। খুঁদকুড়ো খাওয়া 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' (ঘাদানিক) নামক দলটি এদের সহযোগিতায় ক'দিন মিডিয়াকে খুব মাতিয়ে রাখে। যারা ইতিপূর্বে ২০০৭ সালে কট্টর ইসলাম বিরোধী ব্লগ *'মুক্তমনা'*-কে 'জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদক' পুরস্কার প্রদান করেছিল।

নাস্তিকদের ধৃষ্ঠতা : এসব ব্লগ বন্ধ ও চিহ্নিত ব্লগারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাতুল সরওয়ার ও ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম হাইকোর্টে একটি রিট (নং ৮৮৬/১২) দায়ের করেন। রিটে স্বরাষ্ট্র সচিব, তথ্য সচিব, পুলিশের আইজি, র‍্যাবের ডিজি এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনকে (বিটিআরসি) বিবাদী করা হয়। বিচারপতি মির্জা হোসাইন হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম সরকারের দ্বৈত বেঞ্চ অবিলম্বে এই সকল ওয়েবসাইট ও ব্লগ বন্ধ এবং অপরাধীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়ে রুল জারি করেন। হাইকোর্টের আদেশে বলা হয়, "Pending hearing of the Rule, the respondents are hereby directed to take all necessary steps to block the above noted facebooks/websites/webpages and URL and/or any other similar internet sites and also to initiate investigation to identify the perpetrators of all such offensive websites, at once and submit a report along with compliance within 2 weeks from the date of receipt of this order" (রুল নিস্পত্তি প্রক্রিয়া চলাকালে বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, তারা যেন এই মুহূর্তে আপত্তিকর সকল ফেসবুক/ ওয়েবসাইট/ ওয়েব এবং ইউআরএল এবং/অথবা অন্যান্য ইন্টারনেট সাইট বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এই সকল ওয়েবসাইটের হোতাদের খুঁজে বের করে। একই সঙ্গে আদালতের আদেশে ওইসব ওয়েবসাইট, ব্লগ ও ওয়েবপেজের স্বত্বাধিকারী এবং ধর্মদ্রোহী ব্লগারদের অনুসন্ধান করে তাদের নাম-ঠিকানাসহ পূর্ণ পরিচয় আদালতে পেশ করে। এই আদেশ প্রাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে নির্দেশ প্রতিপালন ও প্রতিবেদন পেশ করার নির্দেশ দেয়া হলো)। হাইকোর্টের এই রায়ের জবাবে আসিফ তার ফেসবুকে লেখে "আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সচেতনভাবে ঐ যুক্তিহীন অন্ধ ষাঁড়ের মতো উৎকট দুর্গন্ধময় ধর্মীয় অনুভূতি এবং ঐ যুক্তিহীন ধর্মীয় অনুভূতির রক্ষক আদালত, দুই জিনিসেরই অবমাননা করলাম"। হাইকোর্টকে কটূক্তি করে আসিফ আরও লিখেছে যে, "তোমাদের যুক্তিহীন হাস্যকর অনুভূতি এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের দায় আমার নয়, অযৌক্তিক সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা, তা যাচাই করা, প্রয়োজনে ছুড়ে ফেলা আমার বাকস্বাধীনতা এবং আমার অধিকার। কোন সভ্য আদালত আমার এই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না" *(দৈনিক আমার দেশ, ধর্ম ও আদালতের অবমাননা করছে ব্লগার চক্র,* ২২.২.২০১৩)। এছাড়াও শাহবাগীরা সেখান থেকে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদককে ধমক দিতে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটি দেশের ৯০% মানুষের ধর্মকে ঘৃণা করে, তার বিরুদ্ধে লিখে কিভাবে তারা প্রকাশ্য আন্দোলন করার দুঃসাহস পায়? শুধু ধর্ম বিরোধিতা নয়, অত্যন্ত দাপটের সাথে স্বীকারোক্তি করছে ধর্ম ও আদালত দুটোরই অবমাননা করলাম (!!)। একদিকে এই স্বল্পসংখ্যক নাস্তিকের রাষ্ট্রের ধর্ম ও উচ্চ আদালত নিয়ে ধৃষ্টতা, অন্যদিকে সরকারের তাদের ব্যাপারে নীরব প্রতিক্রিয়াই শুধু নয় তাদের দাবীগুলো একের পর এক মেনে নেওয়াতে মনের কোনে অজান্তে এক প্রশ্ন জেগে উঠে তাহলে এরা কি আন্দোলনকারী না হুকুমদাতা? তাদের শক্তি কি তাহলে হাইকোর্ট এর চেয়েও বড়? এখন আবার শোনা যাচ্ছে সরকার তাদেরকে জেল থেকে ছেড়ে আমেরিকা পাঠাচ্ছে *(আমার দেশ, অনলাইন সংস্করণ, ১৬.২.২০১৩)*। এদের যত আক্রোশ কেবল ইসলাম ধর্মের প্রতি কেন? আযান, ছালাত এদের চক্ষুশূল হলে হিন্দু ধর্মীয় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোতে এত উৎসাহ কেন? ইসলাম নিয়ে সমালোচনার ভাষাই বা এত অশ্লীল, এত কুরুচিপূর্ণ হয় কী করে? যে সব ব্লগার এই অপকর্ম করছে, তারা কি সব মানুষরূপী শয়তান? এদের পিতা-মাতার পরিচয়ই-বা কী? সেসব পিতা-মাতা পুত্র-কন্যাদের এই বিকৃত মানসিকতা সম্পর্কে কি অবহিত? না এদের মগজ ধোলাইয়ের কাজে কোনো বিশেষ বিদেশী রাষ্ট্র কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার সংযোগ আছে? সেই রহস্যের উদ্ঘাটনই-বা কে করবে? কিছু ব্লগের মালিকানায় বিদেশি অস্তিত্বের সন্ধান মিলেছে। এ নিয়ে এখনই বিশদভাবে তদন্ত করা দরকার। কথিত 'গণজাগরণ প্রকল্প' বাস্তবায়নে সরকারের সঙ্গে ঢাকার কোন্ কোন্ বিদেশী রাষ্ট্রের দূতাবাস জড়িত ছিল এবং খাদ্য, পানীয় ও নোংরা আমোদ-ফূর্তির বিপুল অর্থায়ন কোথা থেকে হয়েছে সে তথ্যটি পাওয়া গেলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তিনিই সর্বোত্তম কৌশলী'। অতএব, তার কৌশলের কাছে এই শক্তিদের হার মানতেই হবে, সত্যের জয় হবেই, এসব প্রশ্নের জবাবও একদিন মিলবে ইনশাআল্লাহ্।

হেফাজতে ইসলাম : বর্তমানে হেফাজতে ইসলাম ও আল্লামা আহমাদ শফি বহুল পরিচিত দুটি নাম। নাস্তিকদের উত্থানের পর তাদের বিরুদ্ধে হেফাজতের সাহসী ভূমিকা দেশব্যাপী সাড়া ফেলে দেয়। তাদের স্মরণকালের বৃহত্তম লংমার্চ এবং ঐতিহাসিক ঢাকা অবরোধ সহ দেশ ব্যাপী বিভিন্ন যেলায় 'শানে রিসালাত' নামে করা সফল সম্মেলনগুলোতে লাখো জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করে তারা আপামর মুসলিম জনতার কতটা সমর্থন ও ভালবাসা লাভ করেছে। তাই এ পর্যায়ে এসে তাদের পরিচয় সম্পর্কে দুটি কথা না বললেই নয়। হেফাজতে ইসলাম মূলত বাংলাদেশের বৃহত্তম কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী' আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। এরা মাযহাবগত ভাবে হানাফী। উল্লেখ্য উপমহাদেশের হানাফীদের মধ্যে আবার দুটি মাযহাব রয়েছে। ১-ব্রেলভী, ২-দেওবন্দী। হেফাজতে ইসলাম দেওবন্দী মাযহাবের অনুসারী। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল।

১. ব্রেলভী : এই মাযহাবের অনুসারীরা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা সুন্নী বলে থাকে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবের অনুসারী সবচেয়ে বেশী আর হানাফীদের মধ্যে এই ব্রেলভী মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা বেশী। ব্রেলভীদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল তারা কবরপূজারী। কবরে সিজদা দেওয়া, মানত মানা, কবরে চাওয়া, চাদর চড়ানো ইত্যাদি শিরকী কর্মকাণ্ড হল তাদের প্রধান কাজ। তাদের মারকায হচ্ছে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর মাযার, যা 'আজমীর শরীফ' নামে বিখ্যাত। এটা শুধু তাদের দ্বিতীয় মক্কা নয় বরং এই মাযার জিয়ারত করলে একবার হজ্জ করার সমান নেকী হয় বলে তারা বিশ্বাস করে *(নাউযুবিল্লাহ)*।

২. দেওবন্দী : দেওবন্দীদের সেন্টার বা মারকায হচ্ছে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার অর্ন্তগত দেওবন্দ নামক জায়গায় অবস্থিত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ। দেওবন্দীদের 'দ্বিতীয় মক্কা' হিসেবে খ্যাত এই মাদরাসাটি। উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাযহাবকে 'মাসলাকে দারুল উলূম' বা 'মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ' বলা হয় এবং এর অনুসারীদেরকে 'দেওবন্দী' বলা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা ছাত্রদের 'কাসেমী' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, দেওবন্দী মাযহাবটাই কওমী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক, যারা সরকারী কোন অনুদান গ্রহণ করেনা। যেমন আমাদের দেশে হাটহাজারী, পটিয়া ভারতে দেওবন্দ, সাহারানপুর এবং পাকিস্তানে দারুল উলুম করাচী ইত্যাদি। উক্ত মাযহাবের বর্তমান সবচেয়ে মান্যবর ব্যক্তি হচ্ছেন দারুল উলুম করাচীর মুহতামিম জাস্টিস তাকী উসমানী। আশরাফ আলী থানবী, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, আবুল হাসান আলী হাসান নাদভী (র.) এই মাযহাবেরই ধারক-বাহক এবং প্রচারক ছিলেন। দেওবন্দীদের লিখিত বই পুস্তক পড়লে এবং তাদের দারসে বসলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, তারা যেকোন ফতওয়ায় নিজেদের উপরোক্ত উপমহাদেশীয় আলেমদের বক্তব্য বেশী প্রাধান্য দেন এবং তাদের কথাকেই দলীল হিসেবে পেশ করেন। এই সমস্ত ওলামায়ে কেরামকে তারা নিজেদের ভাষায় 'আকাবির' বলেন। অন্যদিকে উপমহাদেশ পেরিয়ে আরব বিশ্বের বড় বড় আলেম যেমন ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, ইবনে কাছীর, নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইবনে বায, শায়খ উছায়মীন (র.) প্রমুখের মতামতকে পাশ কাটিয়ে চলার চেষ্টা করেন এবং তেমন মূল্যায়ন করেন না।

ব্রেলভী ও দেওবন্দী উভয়েই হানাফী হওয়ার পরেও কিছু কিছু মাসআলায় কঠিন বির্তক হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তন্মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে–

১. কবরপূজা ব্রেলভীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেওবন্দীরা এটাকে শিরক বলে।

২. ব্রেলভীরা রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বত্র বিরাজমান বলে বিশ্বাস করে। দেওবন্দীরা এটাকে অস্বীকার করে।

৩. ব্রেলভীরা বিশ্বাস করে রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানেন তথা আল্লাহ তাআলার মত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। দেওবন্দীরা এটাকে শিরক বলে।

এইরূপ কয়েকটি মাসআলায় বিরোধ ছাড়া প্রায় বাকী সব মাসআলাতেই তারা হানাফী ফিকহের তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করেন এবং যারা এই অন্ধ অনুসরণকে অস্বীকার করে তাদেরকে দমন করতে তারা উভয়েই একাট্টা। যাইহোক হেফাজতে ইসলামের ভাইয়েরা এই দ্বিতীয়টির অনুসারী। যদিও হাটহাজারী অন্যান্য দেওবন্দীদের থেকে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও রাখে। যেমন ফরয ছালাতের পর একসাথে হাত তুলে দোআ করার ব্যাপারে হাটহাজারীর ফতওয়া হচ্ছে এটা বিদআত এবং এই ফতওয়ার উপরই তাদের আমল। অন্যদিকে তাদের মারকায দেওবন্দসহ অন্যান্য জায়গায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই দোআর উপর আমল করা হয়ে থাকে।

অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে হেফাজতের আদর্শির্ক সর্ম্পকের ব্যাপারেও কিছুটা ইংগিত না দিলেই নয়। প্রথমত জামাআতে ইসলামীকে তারা ভ্রান্ত ফেরকা বলেই জানে। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মাওলানা মওদুদীর বিরূপ মন্তব্য এবং তারা জামাআতে ইসলামীকে ইসলামী জ্ঞান শুন্য মনে করে। কোন প্রকার মূল্যায়নই করেনা।

দ্বিতীয়ত তারা আহলেহাদীছদের কঠোর বিরোধী এবং বর্তমানে উপমহাদেশব্যাপী তাদের আহলেহাদীছ বিরোধিতা তুঙ্গে। আহলেহাদীছদের সাথে তাদের মৌলিক বির্তক তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তি পূজা নিয়ে। তাদের মধ্যে সাইয়েদ আশরাফ আলী থানভী এটাকে ফরয বলেছেন এবং সাইয়েদ আহমাদ পালানপুরী এটাকে ওয়াজিব লি গায়রিহী বলেছেন। আর আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম এটাকে বিদআত বলেছেন। এই তাক্বলীদকে অস্বীকার করার উপর ভিত্তি করে তারা আহলেহাদীছদেরকে 'গায়রে মুকাল্লিদ' বলে থাকে। যা তাদের কাছে গালি-র সমতুল্য। গত ১৩.২.২০১৩ তারিখে দারুল উলুমে অনুষ্ঠিত পরামর্শসভা থেকে সালাফী বা আহলেহাদীছদের উত্থান দমনে তারা সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দেন। ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য শুনাকে তারা হারাম ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে আলবানী (র)-এর ইলমী খিদমতও তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাঁর লেখনির ইলমী জবাব দেওয়াও দুঃসাধ্য।

তৃতীয়ত তাবলীগ জামাআতের সাথে তাদের সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা কিছুটা জটিল। তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস যিনি দেওবন্দীদের পরিচালিত বড় বড় মাদরাসা (যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর কোন শিক্ষক ছিলেন না বা তাদের নিকটে মান্যবর কোন বড় আলেমও ছিলেন না। উভয়ের সেন্টার বা মারকায এবং দলীয় আমীরও আলাদা। যেমন ভারতে তাবলীগ জামাআতের মারকায নিযামুদ্দীন, আর দেওবন্দীদের দারুল উলূম। বাংলাদেশে তাবলীগের মারকায কাকরাইল আর দেওবন্দীদের হাটহাজারী। কিন্তু এ কথা সত্য যে, দেওবন্দীদের আশ্রয়েই চলছে তাবলীগ জামাআত। সর্বপ্রথম এই আশ্রয় দেওয়ার কাজটা করেন মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরের মুহাদ্দিছ মাওলানা যাকারিয়া। তিনিই 'তাবলীগী নিসাব'কে জমা করে 'ফাযায়েল আমল' নাম দেন এবং তাদের মধ্য থেকে অনেকেই তাবলীগ জামাআতের উপর আহলেহাদীছ আলেমদের আপত্তির জবাবে বইও লিখেছেন। যদিও অদ্যাবধি তাবলীগ জামাআত কোন 'দারুল ইফতা' খুলেনি বরং এখনো ফতোয়া ও মাসআলা-মাসায়েলের বিষয়ে দেওবন্দীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শরণাপন্ন হন কিন্তু অচিরেই

হয়তোবা তারা এ পথে পা বাড়াবেন। কেননা তারা অভ্যন্তরীণভাবে অনেক মাসআলা-মাসায়েল নিজেরাই পরামর্শ করে সমাধান করে নেন। যেমন মহিলাদের চিল্লায় বের হওয়ার বিষয়টি তারা জায়েয বলেছেন। যদিও দারুল উলুম অনেক শর্তারোপের মাধ্যমে জায়েয করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু 'দারুল উলূমে'ই এই মাসআলার কঠিন বিরোধী আলেম-ওলামা আজও মওজুদ আছেন। এখানে সবচেয়ে সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে দুটি বিষয়। প্রথমত চিল্লা লাগানোর ব্যাপারে তাবলীগী ভাইদের বাড়াবাড়ি, যেমন তারা দাওরা পাশ করার পরে ১ বছর চিল্লা না লাগালে পূর্ণ আলেম মনে করেননা। এমনকি তাদের পরিচালিত মাদরাসা ও মসজিদের ছাত্র ও শিক্ষক এবং ইমাম হওয়ার জন্য ১ বছর চিল্লা লাগানো শর্ত। এমনকি বিশ্ব ইজতেমায় চিল্লার বরকতে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ পাকিস্তানী ক্রিকেটার সাঈদ আনোয়ার বয়ান বা বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পেলেও দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন আল্লামা আহমাদ শফি কোন কথা বলার সুযোগ পাবেন না। কেননা তিনি যে চিল্লা লাগান না। শুধু বিশ্ব ইজতেমা নয় তাদের ছোট-খাট বৈঠকে চিল্লা না লাগানো কোন ব্যক্তি কথা বলতে পারেনা।

দ্বিতীয়ত মাদরাসা ছাত্রদের অত্যধিক হারে চিল্লা লাগানোর প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। ফলত যেখানে প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে পুরাতন পড়া রিভাইজ দেয়া দরকার, সেখানে তারা ৩ দিনের চিল্লায় বের হন। অন্যদিকে যেখানে আগের জামানার শিক্ষকরা বলতেন 'জিসনে ছুটি কো ছুটি সামঝা উসনে ইলম কো খোয়া আওর জিসনে ছুটি কো গানীমাত সামঝা উসনে ইলম কো হাসিল কিয়া' তথা 'যে ছুটিকে ছুটি মনে করল সে বিদ্যা হারিয়ে ফেলল আর যে ছুটিকে ইলম অর্জনের জন্য সুযোগ মনে করল সেই ইলম অর্জন করল', সেখানে সকল ছুটিতে চিল্লায় বের হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি চলতে থাকে। আমি এখানে অনেক মেধাবী পড়ুয়া ছেলেকে দেখেছি যারা তাবলীগী ভাইদের ভয়ে পালিয়ে বেড়ান। ফলত ধীরে ধীরে ছাত্রদের মাঝ থেকে ইলম উঠে যাচ্ছে। উপরোক্ত দুটি কারণে দেওবন্দী আলেম- ওলামা চিন্তিত। যেমন মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানীর ছেলে জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দ এর আমীর মাওলানা আরশাদ মাদনী এ বিষয়ে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নেন। ছাত্রদের চিল্লায় যাওয়াতে পড়া শোনা নষ্ট হওয়ায় একে ছাত্রদের জন্য গুনাহের কাজ বলেছেন। তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন, একটা ছেলে দাওরা পাশ করার পর টানা ১ বছর চিল্লা লাগানোতে ৬-৭ বছরে যা শিখেছিল তা ভুলে জাহেলে পরিণত হয় এবং এই কারণেই বর্তমানে আর বড় বড় আলেম তৈরী হচ্ছনা। অন্যদিকে 'ফাযায়েলে আমলে' বর্ণিত জাল ও যঈফ হাদীসের উপর আহলেহাদীছ আলেমদের কড়া সমালোচনাও তাদের পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা তাতে এমন অনেক হাদীছ আছে যা তারাও মানতে পারেন না।

যাইহোক উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেওবন্দীদের সাথে অন্যদের সম্পর্কের দিকটি ফুটে উঠেছে বলে বিশ্বাস করি। এখন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। হেফাজতে ইসলাম এবং তার সাথে একতাবদ্ধ হওয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন যেমন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস ইত্যাদি সবাই মাযহাবগতভাবে দেওবন্দী। এর মধ্যে আহলেহাদীছ, ব্রেলভী বা জামাআত-শিবির নেই। কিন্তু দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে তাদের উত্থানকে জামাআত-শিবির, আহলেহাদীছসহ প্রায় সব ইসলামী দল আন্তরিক সমর্থন জানায় এমনকি এই কাজে নেমে জামাআত তার অন্ধের ষষ্ঠি 'দিগন্ত টিভি' হারায়। অন্যদিকে ভ্রান্ত কবরপূজারী ব্রেলভীরা ন্যক্কারজনকভাবে হেফাজতের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করলেও পীর-মাযার সমর্থক দৈনিক ইনকিলাব তাদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে হেফাজতের কর্মসূচীকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। তারপরও কথায় আছে 'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র আমীরে জামাআত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যদি 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হত তাহলে হয়তোবা ৫মে দিবাগত রাতের পরিস্থিতি অন্যরকমও হতে পারতো। তাই এখনো হেফাজতে ইসলাম যদি মাযহাবী দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে সকল ইসলামী দলকে নিয়ে মাঠে নামে, তাহলে ইনশাআল্লাহ এই ইসলামী বিরোধী শক্তির ধ্বংস সুনিশ্চিত হবে এবং ইসলামী বিপ্লবের পথ সুগম হবে ইনশাআল্লাহ।

৫/৫ আলেম-ওলামার রক্তে লাল হল বাংলার মাটি : ৫মে দিবাগত রাতটি পৃথিবীর ইতিহাসে ঐতিহাসিক কালো রাত হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। কারো মনে থাক আর না থাক এদেশের ইসলামপ্রিয় জনতা চিরদিন মনে রাখবে ঐ রাতকে। নিরস্ত্র ছালাতরত কিংবা দোআয় মগ্ন মানুষদের উপর মধ্য রাতের নিকষ আধারে গণহত্যা চালানোর এক নজিরবিহীন দৃশ্যের অবতারণার রাত এটি। নাস্তিকদের ফাঁসির দাবীতে হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক আহূত লংমার্চে জনগণের বিপুল সমর্থন ও হৃদয়নিংড়ানো ভালবাসা এবং নাস্তিকদের প্রতি বাংলার জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ঘোষণা আসে ৫ মে ঢাকা অবরোধের। এরপর দেশব্যাপী প্রায় ২০-এরও অধিক 'শানে রিসালাত' নামে মহাসম্মেলন করে হেফাজত। তারপর আসে ৫ মে। আগের দিন বিএনপির ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটামে পরিবেশ একটু গরম গরম ছিল। এর মাঝেই শুরু হয় হেফাজতের ঢাকা অবরোধ, যা মূলত ঢাকায় প্রবেশের ৬টি পয়েন্ট ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে বৃহত্তম অবরোধ বলা যেতে পারে এটিকে। দুপুরের পর সরকারী কূটচালে পড়ে অবরোধ ছেড়ে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সমাবেশ করার পরিকল্পনা করে হেফাজতে ইসলাম। যোহর ছালাতের পর লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রিয় মানুষের যাত্রা শুরু হয় মতিঝিল অভিমুখে। যাত্রা শুরু হওয়ার পরে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে পুলিশ এবং সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা পথে পথে

হামলা করে তাদেরকে বাধা দেয়। একদিকে অনুমতি অন্যদিকে বাধা এই দ্বিমুখী নীতি সবাইকে আশ্চর্য করেছে। ফেসবুকে প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন মহিলা ও কিছু দুর্বৃত্ত একজন মাদরাসার ছেলেকে মাটিতে ফেলে সাপের মত পিটাচ্ছে। হেফাজতে ইসলামের সদস্যরা মোমবাতি নয় যে আগুন লাগালেও চুপচাপ বসে থাকবে। তারা মানুষ। সুতরাং মানুষ হিসেবে আত্মরক্ষার চেষ্টা তারা করবে। সেই হিসেবে তারা সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি ছোড়া শুরু করে। এভাবে রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষ, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। অন্যদিকে মতিঝিলে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলতে থাকে। মূলত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা গায়ে পড়ে পরিকল্পিতভাবে পরিবেশকে বিশৃংখল করে তুলে। তাইতো কথায় বলে 'ষাড়কে লালশালু দেখাতে নেই'।

অন্যদিকে সমাবেশে আল্লামা আহমাদ শফির আসার কথা থাকলেও পলাশীর মোড় থেকে কোন অজ্ঞাত কারণে তাকে নিরাপত্তার সমস্যা

দেখিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। আর সমাবেশস্থলে আহমাদ শফির নামে আন্দোলনরত কর্মীদের দাবী অনুযায়ী লাগাতার অবস্থানের ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর সারাদিনের অবরোধ, সংঘর্ষে ক্লান্ত হেফাজত কর্মীরা রাস্তায় শুয়ে পড়ে। এদিকে শাপলা চত্বর এলাকায় লাইট বন্ধ করে দিয়ে এক ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। ঠিক রাত দুইটার সময় শুরু হয় মূল অপারেশন। যার নাম পুলিশের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল 'অপারেশন সিকিউরড শাপলা'; অন্যদিকে বিজিবি একই অপারেশনের নাম দেয় 'অপারেশন ক্যাপচার শাপলা'। এর আরও একটি নাম শোনা যায় অপারেশন ফ্লাশ আউট। হ্যান্ডমাইক থেকে শাপলা চত্বর ছেড়ে দেয়ার আহব্বান জানানো হয়। এই আহ্বানে ঘুমন্ত মানুষগুলো জেগে উঠল কি উঠলনা তা না দেখেই শুরু হয় তিনদিক থেকে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবির স্মরণকালের ভয়াবহ নিকৃষ্ট গণহত্যা। এই গণহত্যার দৃশ্য সরাসরি সম্প্রচার করার দায়ে বন্ধ করে দেয়া হয় ইসলামিক টিভি ও দিগন্ত টিভি। আরও আগে থেকেই বন্ধ ছিল আমার দেশ। অনেকেই এই গণহত্যাকে হিটলারের ইহুদী হত্যার সাথে তুলনা করেছেন, অনেকেই আবার জালিয়ানওয়ালাবাগের সাথে আবার অনেকেই ২৬ মার্চের কালো রাতের সাথে। আমি বলব এগুলোও গণহত্যা ছিল। মানবিক দিক থেকে এগুলোও অন্যায় ছিল। কিন্তু তা ৫ই মের গণহত্যার সাথে তুলনীয় নয়। কেননা হিটলার তার ধর্মবিরোধী এবং তার বিশ্বাসে তার নবীকে হত্যাকারী, আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত জাতিকে হত্যা করেছিল। কিন্তু এখানে হত্যা করা হয়েছে কুরআনের হাফেজকে, হাদীছের পাঠককে। আর কোন বিজাতীয় লোকেরা হত্যা করেনি, করেছে স্বজাতি। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছিল তারা ছিল ইংরেজ। তারা তো এদেশে অত্যাচার করার জন্যই এসেছে। আর এখানে জান-মাল রক্ষার ওয়াদা দিয়ে জনগণের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া সরকার সেই জনগণের উপর হত্যাকান্ড চালিয়েছে। আর ২৬ মার্চের কালো রাত সেখানে আমরা ধর্মগতভাবে এক হলেও ভাষাগতভাবে আলাদা জাতি ছিলাম এবং আমাদের দ্বন্দ্ব ছিল রাজনৈতিক। তারা আমাদের প্রাপ্য হক্ব না দিয়ে অন্যায়ভাবে আমাদের শাসন করতে চাইছিল আর আমরা তাদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিলাম। সুতরাং সেখানে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। বিনা প্রতিরোধে যেমন আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারতামনা, তেমনি বিনা আক্রমণে তারা আমাদের তাদের অধীনে রাখতে পারতনা। কিন্তু এখানে তো কারো ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে যাওয়া হয়নি, কারো কাছে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানানো হয়নি। আপনি বলতে পারেন তারা যে শাপলা চত্বরে লাগাতার অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছিল। আমি বলব যদি অবস্থান গ্রহণ অপরাধ হয়, তাহলে এক অপরাধের দুই সাজা এটা আবার কোন ইনসাফ? যারা শাহবাগে অবস্থান করল তারা পাবে বিরিয়ানী আর যারা মতিঝিলে অবস্থান করল তারা পাবে গুলি। সত্যিকারেই স্মরণকালের ভয়াবহ গণহত্যা এটি যার কোন তুলনা নেই। তারা কি অপরাধ করেছিল যে সরকার এত বেপরোয়া হয়ে উঠল? কোন অপরাধই খুঁজে বের করতে পারবে না। তবে হ্যা একটা অপরাধ আছে যেই অপরাধের জন্য আপনাদের এত আক্রোশ। আর সেটা হচ্ছে এরা ছিল মুসলমান। একজন মুসলমান হিসেবে তাদের প্রাণপ্রিয় নবীকে কটূক্তিকারীদের বিচার চাইতে এসেছিল। এটাই আর সহ্য হয়নি। তাই তাদের হত্যা করে মনের ঝাল মিটালেন। তাইতো মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে এদেশে তাহলে ইসলাম কি পরাধীন? পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম পরাধীন! তাহলে এই দেশ চালাচ্ছে কারা? মুসলমানরা না অন্য কেউ?

সে যাইহোক উক্ত ঘটনায় অনেক প্রশ্ন জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সবচেয়ে বড় ও জটিল প্রশ্ন হচ্ছে সেই ঘটনায় কত মানুষ মারা গিয়েছিল এবং তাদের লাশ কি করা হয়েছে। সে বিষয়ে নানা মুণির নানা মত। ৮ মে বুধবার রাশিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত চ্যানেল 'আরটি' জানিয়েছে নিহতের সংখ্যা ৪০০-এর মত। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' বলেছে, শাপলা চত্বরে শত শত লোককে হত্যা করা হয়। এরপর ট্রাক ও কাভার্ডভ্যানে করে লাশ সরিয়ে ফেলা হয়। হেফাজতে ইসলাম নিহত ও নিখোঁজের মিলে ৩ হাজারের মতো হবে বলে জানিয়েছে। হংকংভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ার 'হিউম্যান রাইটস কমিশন' জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা আড়াই হাজারেরও বেশি হতে পারে। প্রভাবশালী ব্রিটিশ পত্রিকা ইকোনমিস্ট বলছে, অন্তত ৫০ জন লোক নিহত হয়েছে। এটাকে 'গণহত্যা (ম্যাসাকার) বলেই মনে হচ্ছে' বলে মন্তব্য করেছে ইকোনমিস্ট। বার্তা সংস্থা এপির বরাত দিয়ে মার্কিন টিভি স্টেশন সিএনএন জানায়, নিহতের প্রকৃত সংখ্যা হয়তো কখনোই জানা যাবে না। উপরোক্ত তথ্যগুলো দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যদিকে সরকার ও তার পদলেহী মিডিয়াগুলো এই ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। তারা হতাহতের সংখ্যাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। এমনকি অনেকেই চরম মিথ্যাচার করে বলেন কেউ হতাহত হয়নি। যেমন– ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মুখপাত্র মাহবুব-উল আলম হানিফ অবলীলায় নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে বসলেন শাপলা চত্বরে কোনো লোক হতাহত হয়নি। তার এই মন্তব্যকে নিউএজ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে outrageous (নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ, মর্মান্তিক) বলা হয়েছে।

দেশীয় মিডিয়ার লুকোচুরি : অপারেশনের সময় নিরস্ত্র ও ঘুমিয়ে থাকা হেফাজতকর্মীদের উপর যৌথবাহিনীর নৃশংসতা নিয়ে দেশের মিডিয়া ভয়ঙ্কর লুকোচুরি করে। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ব্যাপারটি হল, ৬ মে'র প্রায় সবক'টি পত্রিকা অপারেশন সংক্রান্ত খবরগুলোর বহু নাটকীয় শিরোনাম দেয়ার চেষ্টা করলেও বেশিরভাগ পত্রিকাই তাদের শিরোনামে হতাহতের কোনো তথ্যই দেয়নি। শিরোনামগুলো পড়ে

মনে হবে অপারেশনটি অত্যন্ত 'শান্তিপূর্ণ' ছিল! যেমন– জনকণ্ঠের শিরোনাম 'দশ মিনিটেই শাপলা চত্বর মুক্ত', সমকালের শিরোনাম, '১০ মিনিটের সাঁড়াশি অভিযান', কালেরকণ্ঠ 'রুদ্ধশ্বাস আধাঘণ্টা', যুগান্তর 'অপারেশন মিডনাইট : শ্বাসরুদ্ধকর ১ ঘণ্টা'। অন্যান্য পত্রিকার অবস্থাও তথৈবচ। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কালের কণ্ঠ, জনকণ্ঠ, যুগান্তর নিহতের কোনো তথ্যই দেয়নি! কেবল নিউএজ পত্রিকা কমপক্ষে একশ' জন নিহত হয়েছে বলে জানায়।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, কত মানুষ নিহত হতে পারে ঐ ভয়াল রাতে। প্রথমত সেইদিন কত রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছিল তা জানা যাক। ১২ মে রোববারের যুগান্তর পত্রিকায় ৬ কলামে লিড খবরের শিরোনাম ছিল 'দেড় লক্ষাধিক গোলাবারুদ ব্যবহার, হেফাজত দমনে সরাসরি অংশ নেয় ৭ হাজার ৫৮৮ সদস্য'। একইদিনে ঢাকার কাঁচপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, সানারপাড় এলাকা এবং হাটহাজারী ও বাগেরহাটে হেফাজতকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ব্যবহৃত গোলাবারুদসহ সারাদেশে হেফাজতকর্মীদের শায়েস্তা করতে ব্যবহৃত গোলাবারুদের সংখ্যা যোগ করলে সেটা ২ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। ২ লক্ষ গোলাবারুদে কত মানুষ মারা যেতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর কেউ মারা যায়নি এই কথা কত নিচু মানের মিথ্যুক হলে বলতে পারে তাও প্রশ্নাতীত। দুঃখ লাগে যখন সেই মিথ্যুক হয় একজন মন্ত্রী, অপমানবোধ হয় যখন দেখি সেই মিথ্যুক হচ্ছে জাতির বিবেক বলে পরিচিত সাংবাদিক সমাজ। আর আশ্চর্য হই যখন ভাবি, যে সরকার মিডিয়ার স্বাধীনতাকে গলাচিপা হত্যা করতে চায় সেই মিডিয়া কিভাবে সরকারের গোলামী করে!!

এ সময় কাতারভিত্তিক আল জাযীরা এই বিষয়ে সবচেয়ে প্রশংসিত ভূমিকা পালন করেছে। আল জাযীরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, মতিঝিলের শাপলা চত্বরে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করেনি বাংলাদেশ সরকার। চ্যানেলটির কাছে যে নতুন ভিডিও ফুটেজ এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। সেই সাথে ফেসবুক, টুইটারের বিভিন্ন পেজও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং হত্যাকাণ্ডের ফুটেজ তুলে ধরে। যাই হোক সরকার যতই চেষ্টা চালাক না কেন সত্য কোনদিন লুকিয়ে থাকেনা। তাকে যতই চাপানোর চেষ্টা করা হোক তা একদিন প্রকাশ হবেই।

এছাড়া জনমনে আরো বহু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে সবচেয়ে যেটা অবাক লেগেছে তা হ'ল, অতীতে পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো উদ্বেগজনক বা মর্মান্তিক ঘটনায় সুয়োমোটো রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। সম্প্রতি সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনায়ও হাইকোর্ট রুল জারি করেছে। এর আগে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষকের মৃত্যু, ইবনে সিনা হাসপাতালে এক নবজাতকের মৃত্যু, কলেজের মেয়েদের বোরকা পরতে বলা, গ্রাম্য সালিশ, বিচারপতিকে পুলিশের সালাম না দেয়া প্রভৃতি ঘটনায় হাইকোর্ট সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরসহ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো রুল জারি করেছে। কিন্তু সম্প্রতি মতিঝিলে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে, অথচ হাইকোর্ট এ বিষয়ে কোন প্রকার রুল জারি করল না কেন? তাহলে হাইকোর্টের মোটিভটা কি? কেবলই ইসলাম বিরোধিতা?

মিডিয়ার মিথ্যাচার : দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, যেখানে এতবড় একটা গণহত্যার পর মিডিয়ার উচিৎ ছিল আহত-নিহত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং এই গণহত্যার প্রতিবাদ জানানো। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দেশীয় মিডিয়াগুলো ভয়ংকর তথ্যসন্ত্রাসে লিপ্ত হয়। তারা উল্টা নাশকতা সৃষ্টি, বিশৃংখলা তৈরী, গাছ কাটা, ব্যাংক লুট ও কুরআন পুড়ানোর মত অভিযোগে অভিযুক্ত করে হেফাজতকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম আলোর কথা। ৭ মে পত্রিকাটি শাপলা চত্বরের অভিযান ও হেফাজতের অবস্থানের বিভিন্ন দিক এবং এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য সংবলিত মোট ৩৩টি সংবাদ ছাপিয়েছে। এর মধ্যে মাত্র তিনটি ছিল হেফাজতের পক্ষে দেয়া বিএনপি, জামায়াত ও হেফাজতের বিবৃতিমূলক। এছাড়া ১২টি বিশেষ প্রতিবেদন ছিল যার কয়েকটির শিরোনাম হলো, 'হেফাজতের ধ্বংসযজ্ঞে নিঃস্ব অনেক ব্যবসায়ী', 'তাণ্ডবে বাদ যায়নি রাস্তার গাছও', 'ধ্বংস, তাণ্ডব আর সবুজ উপড়ানোর চিত্র', 'যেন যুদ্ধ-পরবর্তী ধ্বংসলীলা', 'শিশুদের অরক্ষিত রেখে চলে যান নেতারা', 'হাজারো কর্মী নিয়ে মাঠে নামে ডিসিসি', 'ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী হাউস বিল্ডিং', 'হেফাজতের কর্মীদের রোষানলে ব্যাংক', '৪০০ বছর বয়সী ঢাকায় এ এক কালো অধ্যায়' ইত্যাদি। বাকি সংবাদগুলো হেফাজতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে সরকারের ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের দেয়া বক্তব্য ভিত্তিক। সঙ্গে রয়েছে পুরো এক পাতার ফটোফিচার। এরপরের দু'দিনও পত্রিকাটিতে এ ধরনের প্রতিবেদন অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, যে কয়জন লোকের নিহতের কথা পত্রিকাটি স্বীকার করেছে তাদের মৃত্যুপরবর্তী কোনো 'ফলোআপ' সংবাদ ছাপায়নি! অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের পর নিহতের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক বহু রকমের 'মানবিক সংবাদ' পরিবেশনে প্রথম আলো সবার চেয়ে অগ্রগণ্য হলেও ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হেফাজতের কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রথম আলো একেবারেই নীরব! অবশ্য সেদিন মতিঝিল এলাকায় কয়েকটি ছোট ছোট গাছ কাটার জন্য হেফাজতকে দায়ী করে পত্রিকাটির সে কী মায়াকান্না!

অন্যান্য পত্রিকা যেমন কালেরকণ্ঠ, সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন, জনকণ্ঠ, সকালের খবর, যায়যায়দিন ইত্যাদি সবার চিত্রও প্রায় একই রকম। টিভিগুলোর সংবাদ ও অন্যান্য প্রোগ্রামেও চলছে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নীরবতা এবং সরকারদলীয়দের অপকর্মকে হেফাজতের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতা। আর এদিকে সরকার দেশব্যাপী হাজার হাজার মামলা দিয়ে মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের গণগ্রেফতার শুরু করে। কিন্তু এসব 'গল্প' যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা ভিন্নমতের দু'একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে এরই মধ্যে উঠে এসেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ৭ মে ইনকিলাব 'স্বার্থবাদী মিডিয়া যুবলীগের সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে মরিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদনে জানায়, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস সংলগ্ন বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে যুবলীগের কিছু সন্ত্রাসী বইয়ের দোকানে আগুন দেয়। এ সময় সেসব দোকানে থাকা বিভিন্ন ইসলামী বইয়ের সঙ্গে পবিত্র কুরআনের অনেক কপিও পুড়ে যায়। ঐদিন হাউস বিল্ডিং করপোরেশনের 'কার পার্কিংয়ে' আগুন দিয়ে অর্ধশত গাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার দায় হেফাজতের উপর চাপিয়ে ৮ মে প্রথম আলো 'ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী হাউস বিল্ডিং' শীর্ষক একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপে। কিন্তু একইদিন ইন্টারনেটে লিক হওয়া একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, জিন্সের প্যান্ট-শার্ট ও মাথায় হেলমেট পরা কিছু যুবক দীর্ঘ সময় ধরে প্রথমে পার্কিংয়ে থাকা গাড়িগুলো ভাংচুর করে এবং পরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরা যে হেফাজতের সমাবেশে আসা কওমী মাদরাসার পাঞ্জাবী-পায়জামা-টুপি পরা লোকজন নয়, তা সবার কাছে পরিষ্কার। এই ভিডিওটি আমারদেশ পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছে আছে বলে তারা জানায়। সবচেয়ে বড় কথা যারা কুরআনের ইযযত রক্ষার জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তারা কিভাবে কুরআন পুড়াতে পারে? মিথ্যা বলারও তো একটা সীমা থাকা চাই। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে তারা মানুষ হত্যা করার জন্য হেফাজতকে দায়ী করছেনা। দায়ী করছে শুধু জ্বালাও-পোড়াও ও ভাংচুরের ব্যাপারে। কেননা মানুষ মারার কথা বললে তো লাশ দেখাতে হবে কিন্তু যত লাশ সব যে দাড়ি টুপি ওয়ালার। আর তান্ডবের ক্ষেত্রে শুধু ধ্বংস হওয়া জায়গাটার ছবি দেখালেই চলবে। হায়রে মিথ্যুক মিডিয়া!

হেফাজত নেতাদের ভূমিকা : অনেকেই প্রশ্ন করেছেন হেফাজতে ইসলাম কেন এমন ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে গেল? কী উদ্দেশ্য ছিল এর পেছনে? এই প্রসঙ্গে সামগ্রিক অবস্থার পর্যালোচনায় যা বেরিয়ে আসে তা হলো, প্রথমত: ইসলামের পক্ষে বড় কিছু অর্জনের সম্ভাবনা। বাংলাদেশের ইতিহাসে হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে যে বহত্তম গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে নিকট অতীতে এর আর নজির নেই। তাই ধারণা ছিল প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারলে ইসলাম ও মহানবী (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন পাসের দাবিটি অন্ত ত আদায় করা সম্ভব হবে। শাহাবাগীদের শাহবাগে বসিয়ে রেখে সরকার যেমন নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য আইন সংশোধন করেছে, তেমনই শাপলায় অবস্থানের মাধ্যমে সরকারকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলা যাবে। কারণ সরকারী প্রশ্রয়ে শাহবাগে টানা অবস্থান এবং শোডাউন হয়েছে। সরকার অবস্থান কর্মসূচীকে সমীহ করেছে। কাজেই এমন কর্মসূচীর ব্যাপারে সরকারের নৈতিকভাবে দুর্বল থাকার কথা। সেই সাথে মাঠপর্যায়ের জনশক্তির পক্ষ থেকে এমন কর্মসূচির চাপ ছিল। সব সময় ইসলামপন্থীরা আন্দোলন করে। কিন্তু কোনো দাবিদাওয়া আদায় হয় না। এবারের জাগরণ নজিরবিহীন হওয়ায় মানুষের প্রত্যাশাও ছিল বেশি। তা ছাড়া লাখ লাখ মানুষের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ওপর সরকার এমন নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালাবে এমনটি তাদের কল্পনায়ও ছিল না।

হেফাজতের নেতাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল ও আছে মর্মে যে প্রচারণা কোনো কোনো মহল চালায় সে ব্যাপারে আমাদের ধারণা হল, হেফাজতের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক চিন্তার ঊর্ধ্বেই ছিলেন।

বিরোধী দলের ভূমিকা : হেফাজতে ইসলামের ব্যাপারে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির ভূমিকা ছিল চরম মুনাফেকীপূর্ণ। এক দিকে তারা হেফাজতের কোনো একটি দাবির ব্যাপারেও ইতিবাচক দৃষ্টি দেখায়নি, কিন্তু গায়ে মেখে আবার হেফাজতের আন্দোলনের ফসল নিজেদের ঘরে তুলতে চায়। হেফাজতের আন্দোলনে গড়ে ওঠা সেন্টিমেন্টকে এমনি এমনিই নিজেদের পকেটে নিতে সস্তা ঘোষণাও দেয়। হেফাজতের পক্ষে মাঠে নামার জন্য বিরোধীদলীয় নেত্রীর ঘোষণায় বিএনপির কোনো জনশক্তি তো মাঠে নামেইনি, উপরন্তু হেফাজত সরকারের আরো বেশি টার্গেটে পরিণত হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও ঈমানী ইমেজ নষ্ট করতেই বরং বেশি ভূমিকা রেখেছে বিএনপির এসব কার্যক্রম। বিএনপির যদি সাহায্য করার ইচ্ছাই থাকে তাহলে সে ঘোষণা না দিয়েই গোপনে নিজের কর্মীদের মাঠে নামার নির্দেশ দিতে পারত। কেননা বিপক্ষ পার্টি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা জেনে গেলে আগেই শক্ত হয়ে যায়।

অজানা আশংকা : ইসলামের নাম নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রবণতা পাকিস্তান যুগ থেকে আজ অবধি চলে আসছে। সবাই ধর্মকে ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। সেই হিসেবে ৫ বছরের মেয়াদে যে যাই করুক না কেন যখন মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় আসে, তখন ধর্মের প্রতি ভালবাসা দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বর্তমান সরকারের সময় শেষ হয়ে আসলেও সেই ধরনের মনোভাব বুঝা যাচ্ছেনা। বরং সরকার নিজেকে চরম ইসলামবিরোধী হিসেবে তুলে ধরেছে। অথচ সরকার জানে যে ইসলামের বিরোধিতা করলে সে ভোট পাবে না। তাহলে সরকার কি দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে চায় না? না, এটা তো হতেই পারে না। তাহলে সরকারের কাছে কি কারো পক্ষ থেকে এমন কোন গ্যারান্টি আছে যা তাকে ভোট ব্যাংকের চিন্তা থেকে নিশ্চিন্ত করেছে? কে সেই গ্যারান্টি দাতা? শাহবাগী আন্দোলন যা এদেশের ৯০% মানুষের কলিজায় আঘাত করা আন্দোলন; কিন্তু সরকার, ভারত ও মার্কিনীরা এর পক্ষ গ্রহণ করে এবং স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে যে যাক বাংলাদেশকে তাহলে ইসলাম মুক্ত করতে পারা যাবে। কিন্তু তাদের অতি আশা যখন মুসলমানের রক্তের বিনিময়ে গুড়ের বালিতে পরিণত হওয়ার পথে, তখন আন্তর্জাতিক বিশ্বের সংলাপ ও সংযমের পরামর্শ ইসলাম বিরোধীদের প্রতি তাদের সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। এছাড়াও টাকাকে রুপিয়ায় পরিণত করার প্রস্তাব, ভারতের সাথে ট্রানজিট ও অসম সমুদ্র বন্দর চুক্তি, ফারাক্কা বাধের মাধ্যমে ভারতের পানি আগ্রাসনের ব্যাপারে সরকারের নীরবতা, টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে সরকারের মৌনতা, সীমান্তে নির্বিচারে মানুষ হত্যা ও বিজিবির নিষ্ক্রিয়তা অন্যদিকে বিজিবিকে দেশের ভিতরে মানুষ মারার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, নাস্তিকদের পৃষ্ঠপোষকতা, নিরীহ মুসলমানদের গণহারে হত্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সার্বভৌমত্ব বিরোধী সিদ্ধান্ত সবকিছুই যেন এক অজানা বিপদের ইংগিত বহন করছে? একদিকে ভারত, শাহবাগ এবং ক্ষমতাসীন সরকার এবং তাদের বেপরোয়া ইসলাম বিরোধিতা এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরোধী চুক্তি সম্পাদন, অন্যদিকে এগুলোর প্রতিবাদকারী ইসলামপন্থী দেশের বৃহত্তর জনসমাজের উপর বিন্দুমাত্র সহানুভূতির বিপরীতে গণহত্যা ও গণগ্রেফতারের আশ্চর্যজনক খেলা এবং মাঝখানে জাতিসংঘের সংলাপ ও সংযমের পরামর্শ। এক অজানা আশংকার ইংগিত দিচ্ছে। বাংলাদেশ কি তাহলে পরাধীনতার পথে এগুচ্ছে?

উদাত্ত আহ্বান : পরিশেষে বলতে চাই, এই গণহত্যায় শুধু বাংলাদেশের মুসলমান নয় পৃথিবীর সকল মুসলমানের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। মুসলিম বিশ্ব হতভম্বের মত তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের দিকে। এটাই কি সেই বাংলাদেশ যেখানে পৃথিবীর ১৬ কোটি মুসলমান বাস করে? এটা মুসলিম দেশ? অন্যদিকে সারা বাংলাদেশ আজ শোকে মুহ্যমান। দুঃখিত ও মনোকষ্টে জর্জরিত। মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলো থেকে যেন প্রাণচাঞ্চল্য বিদায় নিয়েছে। মসজিদে মসজিদে হচ্ছে কুনূতে নাযেলাহ। নিজের অজান্তেই সকলের হাত উঠে যাচ্ছে আল্লাহর দরবারে। চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। যেই জাতি একদিন ফিলিস্তীন, ইরাক, আফগানের জন্য কাঁদত, আজ তারা নিজের ভাইয়ের জন্য কাঁদছে। সেই দিন বেশী দূরে নয় যেই দিন এই অশ্রু অভিশাপ হয়ে নামবে মানুষ নামের হায়েনা নরপিশাচদের উপর। সেই দিন আর রক্ষা হবে না। যালিমের তখত তাউস ভেঙ্গে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমাদের শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। দেশকে এই পরাধীনতা থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের তরুণ সমাজকে মাঠে নামতে হবে, সকল প্রকার মাযহাবী দ্বন্দ্ব ভুলে বৃহত্তর স্বার্থে সকল ইসলামী দলকে সম্মিলিত হয়ে সংগ্রাম করতে হবে। বিজয় ইনশাআল্লাহ ইসলামের হবেই। তাই তরুণ ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি ইসলামের পরাধীনতা আমাদের পরাধীনতা। আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই। আমাদের এই পরাধীনতার জিঞ্জির ভাংতেই হবে। আমরা তারিক, খালেদ, মূসার বংশধর। ইসলাম ও তার নবীর মান বাঁচাতে জীবন দেয়া তো আমাদের ইতিহাস। তুমি ভুলে গেলে 'রংগীলা রাসূল' বইয়ের লেখককে হত্যা করার অপরাধে যখন তোমাকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বলা হল যে তুমি এই হত্যাকাণ্ডের কথা অস্বীকার কর, তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। তখন তুমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলে, আমি জানিনা আমার জীবনে আমি এই আমলটি ছাড়া তথা নবীকে নিয়ে ব্যঙ্গকারী লেখককে হত্যার নেকআমল ছাড়া অন্য কোন নেকআমল করেছি কিনা। আর আজ কিনা সেই একটি নেকআমলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করব? এরপর হাসি মুখে ফাঁসিকে বরণ করে নিয়েছিলে। আর আজ তুমি বেঁচে থাকতে বাংলার মাটিতে মুহাম্মদ (ছাঃ)-কে অপমান করা হবে? তাহলে এই বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়ায় শ্রেয়। অতএব হে তরুণ! উঠ! গর্জে উঠ! ঝেড়ে ফেল সব সংকোচ! মুক্তির সংগ্রামের জন্য তৈরী হও! বাংলাদেশের ইসলামকে সাম্রাজ্যবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য তৈরী হও! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

নেতৃত্বহীন জাতি : মুক্তির পথ কোথায়?

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকী বসবাস করতে পারে না। সকলে মিলেমিশে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। মানুষের পারস্পরিক শান্তি পূর্ণ সম্পর্কের দর্শন হ'ল সমাজ দর্শন। মানুষ ও পশু-পক্ষী সবাই সামাজিক চেতনা সম্পন্ন। মানুষের মধ্যে জৈবিক চেতনার সাথে সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা সংযুক্ত। ফলে তাদের সমাজ জীবনের বন্ধন হয় সুদৃঢ়, দ্যোতনাময় এবং সর্বব্যাপী। পশু-পক্ষীর চেতনা স্রেফ জৈবিক ও রৈপিক। আত্মরক্ষার স্বার্থে তাদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য চেতনা কাজ করে। সেজন্য প্রত্যেক পশু-পক্ষী স্ব স্ব জাতি ও গোত্রের মাঝে বসবাস করে। হরিণ হরিণের সাথে, বাঘ বাঘের সাথে, বানর বানরের সাথে। এই পশু-পক্ষীগুলিও পরস্পর পরস্পরের নেতৃত্ব সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করে। পাখি আকাশে উড়ে সুশৃংখলভাবে একজন নেতাকে সামনে রেখে। পিঁপড়া মাটিতে চলে সুবিন্যস্ত ধারায় তাদের একজন নেতাকে অনুসরণ করে। মৌমাছি মধু সঞ্চয় করে তাদের রাণী মাছিকে ঘিরে। মৌমাছি বা ভিমরুলকে কেউ আঘাত করলে হাযারটা এসে শত্রুকে দংশন করে। এভাবে সর্বত্র রয়েছে এক ধরনের সামাজিক চেতনা। এই সামাজিক চেতনা থেকে তৈরী হয় নেতৃত্ব চেতনা। সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। আর বহুকে একক পথে পরিচালনার দর্শনকে বলা হয় নেতৃত্ব দর্শন *(সম্পাদকীয় আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০১০)*।

নেতৃত্বের গুরুত্ব

মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নেআমতসমূহের মধ্যে অন্যতম সেরা নেআমত হল নেতৃত্বের যোগ্যতা। এই যোগ্যতা সকল মানুষকে প্রদান করা হয়নি। স্বল্প সংখ্যক মানুয়ের মাঝে এই গুণ সীমায়িত। যাতে তারা সমাজকে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। সমাজ জীবনে দুই ধরনের নেতৃত্ব বিরাজমান। এক প্রকার নেতা সরাসরি আল্লাহ কতৃক মনোনীত। তারা আল্লাহ্র নবী বা রাসূল হিসাবে পরিচিত। যারা সরাসরি আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ফলে তাদের প্রতিটি বিধানগত কর্ম, কথা ও আচরণ অন্য মানুষের জন্য একান্তভাবে অনুসরণীয়। আর শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবী আগমনের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘঠেছে। দ্বিতীয় ধরনের নেতা হলেন মানবীয় গুণসম্পন্ন সাধারণ সমাজনেতা *(সম্পাদকীয় আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০১০)*। তবে মানবীয় গুণসম্পন্ন নেতাদের কর্ম, আচরণ ও কথা অন্য মানুষের জন্য নিঃশর্ত অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় নয়। কেবলমাত্র আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথে তাদের নির্দেশ অনুসরণীয়। কেননা নাফরমানী তথা পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে কোন আনুগত্য নেই। নেতৃত্বের সাথে তারুণ্য অন্তর্ব্যাপ্ত। তারুণ্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। তবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদর্শ, মানসম্পন্ন সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া সেটা কখনো কল্পনা করা যায় না। ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত শত শত। নেতৃত্ব না থাকলে কিছুই সফল হয় না। বাস্তিল দুর্গের পতন হতো না নেতৃত্বের অঙ্গুলি হেলন ছাড়া। সাম্যবাদের বস্তুবাদী আদর্শ ও লেনিনের কঠিন নেতৃত্ব ছাড়া রুশ বিপ্লব সত্তর-আশি বছর টিকে থাকত না। মাও সেতুং সময়মতো লংমার্চ না থামালে ইমাম খোমেনির নেতৃত্বে গণচীনের রেযাশাহকে ছুড়ে ফেলে দিত। তিউনিসিয়ায় বেন আলীকে হটাতে ফুসে ওঠা জনতা নেতৃত্ব পেল রশীদ ঘানুশির মতো ব্যক্তিত্বের। বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে নেলসন ম্যান্ডেলার সফল নেতৃত্ব চিরস্মরণীয়। মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজি ছিলেন ইতিহাস খ্যাত আফগান সেনানায়ক। যিনি মাত্র সতের জন্য সৈন্য নিয়ে অতর্কিত আক্রমণে নদীয়া দখল করেন। ১২০৩ খ্রিঃ যার নেতৃত্বে বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়। উনসত্তরের রাজপথে মাওলানা ভাসানী, জেলে বঙ্গবন্ধু, মিছিলের সামনে ডজন খানেক জাতীয় নেতা, সাথে অগ্রগামীর ভূমিকায় ছাত্রনেতারা। অতঃপর উদিত হয়েছিল বাংলার আকাশে স্বাধীনতার লাল সূর্যের।

পৃথিবীতে কোন পরিবর্তন নেতৃত্ব ছাড়া হয়নি। আবার নেতা ছাড়া কোন ধর্মও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীতে ইসলাম ধর্ম ছাড়া সমস্ত ধর্ম সৃষ্টির পেছনে নেতৃত্ব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ফলে দলে দলে মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়েছে। অথচ একমাত্র ইসলাম ছাড়া সকল প্রকারের ধর্মীয় মতবাদ ও মস্তিস্ক প্রসূত মতবাদসমূহ বাতিল ও পরিত্যাজ্য। পৃথিবীর প্রারম্ভ থেকে ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমান আল্লাহ্র আনুগত্যে নেতৃত্ব মানতে বাধ্য। কিন্তু পাপের কাজে আনুগত্য বা নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য নয় *(মায়েদা ৫/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ না তাকে নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন সেখানে কোন অনুগত্য নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায় ও সৎ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫)*।

আমীর কর্তৃক মা'মূরকে আগুনে ঝাপ দিয়ে আনুগত্যের পরকাষ্ঠা দেখাতে বললে কতিপয় ছাহাবী আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মনস্থির করে এবং কতিপয় ছাহাবী অস্বীকার করে অতঃপর তারা বললেন যে, আমরা তো (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে) আগুন থেকে বাঁচার জন্যই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট পলায়ন করেছি। এমতাবস্থায় আগুন নিভে গেল এবং আমীরের রাগও প্রশমিত হল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট খবর পৌঁছে গেল। তখন তিনি বললেন, যদি তারা আগুনে ঝাঁপ দিত তাহ'লে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করত। আনুগত্য শুধুমাত্র সৎ কাজে *(বুখারী হা/৪১৬৯; মুসলিম হা/৪৭৬৫-৬৬)*। উপরোক্ত হাদীছের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বুঝতে পারি যে, নেতার বা নেতৃত্বের আনুগত্য শুধুমাত্র সৎ কাজের প্রতি। কোন অন্যায় কাজের প্রতি নয়। রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই *(শারহু সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিরাজ করছে তা মানব মস্তিষ্ক প্রসূত বিভিন্ন মতবাদ ভিত্তিক। ফলে আমরা এই জাতিকে নেতৃত্বহীন এক অসহায় জাতি বলতে পারি। কেননা এই মতবাদগুলোর প্রতিটি বিধান, কর্ম, কথা আল্লাহ্র অবাধ্যতায় পরিপূর্ণ। আর নেতৃত্বহীন জাতির অবস্থা ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। নেতৃত্বহীন অবস্থা নৈরাজ্য ও অরাজকতার জন্ম দেয়। বিপদ অনিবার্য করে তোলে। লক্ষ্যহীন হয়ে উঠে নেতৃত্বহীন জনতা। ফলে ভাই ভাইয়ে রক্তের হোলি খেলায় মত্ত হয়। নিজের বা দলের অভিসন্ধি হাসিল করার জন্য গুপ্ত হত্যা, নির্বিচারে মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাই তো শান্তি ও জনগণের দাবী আদায়ের নামে হরতাল করে মানুষের ক্ষতি সাধন, দেশের সম্পদ উৎসাদন করতেও তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় না।

নেতৃত্বের বাস্তবতা

নেতৃত্ব একটি ব্যক্তিক ও সামষ্টিক বিষয়। নেতৃত্ব ব্যক্তির সেই কাঙ্খিত গুণাবলী যা সমষ্টির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উদ্দীপ্ত ও উদ্দিষ্ট করতে পারে। যেমন C I Berrand বলেন, `Leadership refers to the quality of behavior of individuals

where by they guide people a nation by their activities in an organized efforts'.

সাধারণ নেতৃত্ব থেকেই রাষ্ট্র নেতৃত্ব বিকশিত হয়ে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধকালীন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জি ক্লেমেন স্যু বলেছেন, 'একজন রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। আর একজন রাজনীতিবিদ বড় জোর সেবা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে'। একইভাবে টমাস জেফারসন বলেছিলেন, `A politcian thinks for the next election, but statesman thinks for the next generation'. যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাশ্চাত্যের যে সমস্ত রাষ্ট্রাভ্যান্তরে কাঠামোগত স্থায়িত্ব (structural stability) রয়েছে, সে সমস্ত দেশে আইনের শাসন (Rule of law) সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্বকে পরিচালনা করা হয়। আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশে বিকারগ্রস্থ ব্যক্তিতন্ত্র এবং নিকৃষ্ট দলতন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহনে পরিণত হয়েছে। ফলে বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা, অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতা, দুর্নীতি, দলপ্রীতি, গুম, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি নির্মমতা গোটা জাতিকে একটি গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। কারণ আমরা যে থিওরী বা দর্শনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছি তা মানব মস্তিষ্ক প্রসূত। যা কখনো শান্তির কথা বলে না। তা মানুষকে কখনও মুক্তির পথ দেখায় না।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত নেতৃত্ব হল সেই নেতৃত্ব যা মানুষকে আল্লাহর পথে ধাবিত করে এবং ইসলামী আইন-অনুশাসন অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করে। কেননা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে মুক্তির একমাত্র পথ হল অহির বিধানের অনুসরণ করা। এর বাইরে ইসলামী নেতৃত্বের কাছে কোন মানব মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদ কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাহ্যত যত সুন্দরই মনে হোক না কেন মানবরচিত সকল মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল 'জনগনই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' ও 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত'। যা পরিষ্কার শিরকী আক্বীদা। তাই এই মতবাদগুলোর প্রতি যারা মানুষদেরকে আহ্বান জানাবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। কারণ এগুলো জাহেলিয়াতের প্রতি আহ্বানের শামিল। যদিও এরা ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে ও ধারণা করে যে, সে একজন মুসলমান *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত, হা/৩৬৯৪)*। অন্যত্রে আল্লাহ তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ ব্যতীত স্বীয় প্রবৃত্তিকে ইলাহ গণ্য করেছে। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আপনি কি দেখেছেন ঐ ব্যক্তিকে, যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ইলাহ গণ্য করেছে? আপনি কি ঐ লোকটির কোন দায়িত্ব নিবেন? আপনি কি মনে করেন ওদের অধিকাংশ লোক শুনে বা বুঝে? ওরা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তার চেয়েও অধম' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*।

বাংলাদেশে চলমান নেতৃত্বের ভয়াবহতা

বর্তমানে বাংলাদেশ এমন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে যখন শাসক সম্প্রদায় পরিণত হয়েছে সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীতে। কথায় বলা হয় 'রোম যখন পুড়ছে নীরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছে'। ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশ যখন সরকারী বাহিনী তাণ্ডবে জ্বলছে তখন সরকার বলছে দেশে আইন-শৃংখলা সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রয়েছে। অথচ টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, জকিগঞ্জ থেকে শরণখোলা ৫৬ হাজার বর্গমাইল এই দেশটির যেখানে যে দিক যতদূর চোখ যায় এখন কেবল লাশ আর লাশ। সর্বত্র বুকফাঁটা মায়ের আহাজারী, অসহায় ছেলের আর্তনাদে ভারাক্রান্ত আজ দেশের আকাশ বাতাস। পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে সরকার ও বিরোধী দল। গুম হচ্ছে একের পর এক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। বাংলাদেশ এখন আর কোন মানবিক ভূখণ্ড নয়। যেন নৃশংস এক বধ্যভূমি, সরকার এবং বিরোধীদলের কসাইখানা ও লাশের পাহাড়। আইন-কানুন, রীতি-রেওয়াজ ও সভ্যতা-ভব্যতাকে উপেক্ষা করে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে সরকারের পেটোয়া বাহিনী। অন্য দিকে বিরোধী দল সরকারকে হটাতে বদ্ধ পরিকর। মেয়াদী তন্ত্রমন্ত্রের সরকার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে সরকার হয়ে উঠে রক্তপিপাসু। আর বিরোধীদল হয়ে উঠে নৃশংস। ফলে সাধারণ মানুষ হয় বিপন্ন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যদি মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হত তাহ'লে কেন আজ মানবতা বিপর্যস্ত? সর্বত্র কেন এই মানবিক বিপর্যয়? অহির বিধানের পরিবর্তে মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদ আপাতত যত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির বুলি খয়রাত করুক না কেন, প্রকৃত শান্তি ও মুক্তির স্বাদ কখনই বয়ে আনতে পারবে না। পৃথিবীতে যত অশান্তির কালো ছায়া বিরাজ করছে তার পিছনে রয়েছে মানবরচিত মতবাদের হিংস্রতা। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যত সহিংসতা ঘটেছে সেই সব ঘটনাবলি কি এই দলবাজ তন্ত্রমন্ত্রের ব্যর্থতার রাজস্বাক্ষী নয়?

ব্যর্থ নেতৃত্বের রূঢ় বাস্তবতা

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত এক সপ্তাহে সারাদেশে যে রণক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সরকারী হিসাবেই সাধারণ নাগরিক ৩৩, জামায়াত-শিবির ৪৬, বিএনপি ৬, আওয়ামীলীগ ৫, পুলিশ ৭ অর্থাৎ প্রায় শতাধিক মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছে। বেসরকারী হিসাবে তা প্রায় দুই শতাধিক। আহত হয়েছে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে জাতি আজ স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। পাকিস্তানের ২৪ বৎসরের শাসনকালে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ৪২ বছরে স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাড়া স্বৈরাচারবিরোধী সর্বদলীয় গণআন্দোলনেও এক সপ্তাহে এত মানুষ মরেনি। না পুলিশ, না জনতা। এখন যারা ভাগাভাগি হয়েছেন, তারা গত ত্রিশ বছরে নিজেদের প্রয়োজনে কখনো একত্রিত হয়েছেন, কখনো বা এপার-ওপার করেছেন। মাঝখান দিয়ে শুধু প্রাণ গেল কিছু ভক্ত, অনুসারী, চাকুরিজীবী, পুলিশ ও অহসায় সাধারণ জনতার। এই সকল তন্ত্র-মন্ত্র নাকি শান্তির কথা বলে? অথচ স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই তন্ত্র-মন্ত্র জনগণকে শান্তিপূর্ণ স্বচ্ছল নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে পারেনি। বরং তার পরিবর্তে উপহার দিয়েছে সমস্যা জর্জরিত সন্ত্রাসযুক্ত এক নিরাপত্তাহীন জনপদ। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি দলীয়করণ সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণমামলা, গনগ্রেফতারের ছেলেখেলা। বিদ্যমান রাজনৈতিক হাঙ্গামায় সুযোগ নিচ্ছে এক শ্রেণীর অপরাধীচক্র। ব্যক্তিগত আক্রোশ, পূর্ব শত্রুতা, প্রতিশোধ, অবৈধ উপার্জন, লুণ্ঠন, স্থায়ীভাবে প্রভাববলয় বিস্তার, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, জবর-দখল, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণসহ হেন অপরাধ নেই যা এখন প্রকাশ্যে সংগঠিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা অপরাধ করলেও সেটা অপরাধ নয়, হত্যা করলেও সেটা হত্যা নয়। কারণ সে রাজনৈতিক কোন দলের নেতা বা কর্মী। অপরাধী যত বড় অপরাধ করুক না কেন তার দল ক্ষমতায় আসলে তার ক্ষমা হয়ে যায়। 'জজ মিয়া' নাটক, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের নামে ৩৭ মামলার নাটক তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দেশের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছে ৭৫ জন, বিচারবহির্ভূত হত্যা হয়েছে ৫২ জন, বিএসএফের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে ২ জন, গুলি ও ককটেল নিক্ষেপে আহত হয়েছে ৪ জন এবং অপহৃত হয়েছে ১৬ জন । ১৫ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে। ৬৬ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ২৩ জন প্রাপ্ত ও ৪১ জন শিশু ধর্ষিত হয়েছে। সেখানে ২৩ জনের মধ্যে দুজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৯ জনকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। ৪১ জন শিশুর মধ্যে ৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জনকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। এই হ'ল দেশের বর্তমান অবস্থা। স্বাধীনতার পর থেকে এই অবস্থা চলে আসছে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী হ'তে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ মাসে এদেশে ৪ হাযার ৯২৫ গুপ্তহত্যার শিকার হয়, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে ২০৩৫ টি, নারী অপহরণ হয় ৩৩৭ টি, ধর্ষিতা হয় ১৯০ জন মহিলা। স্বাধীনতার শুরুর এবং বর্তমানের অবস্থা যদি এই হয় তাহ'লে মাঝে ৪২ বছরে জাতি কি পেয়েছে? এইটা বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। যখন যে সরকার আসে তখন তার নিকটে এ কাজগুলো স্বাভাবিক রুটিনে পরিণত হয়। আর স্রেফ সরকার নিজেকে টিকে রাখার

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। রক্ত ঝরলেও তাদের কাছে তা রক্ত মনে হয় না বরং সেটা আবর্জনা মনে হয়। বর্তমান সরকারের পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী আব্দুল লতীফ ছিদ্দীকী বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় বলেন, ৪২ বছরের আবর্জনা পরিষ্কার করতে যাচ্ছি। এতে একটু ধুলা উড়বে, একটু ভেঙ্গে পড়বে, কিছুটা রক্তপাত তো হবেই *(দৈনিক আমার দেশ, ৬ মার্চ ২০১৩)*।

আইন-শৃংখলার এই দুরবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের বিপর্যয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহিংসতা

তন্ত্র-মন্ত্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মূলতঃ খুনী স্টালিনের নব্য অনুসারী। স্টালিন বলতেন, 'হত্যা সব সমস্যার সমাধান'। বন্দীদের কাছ থেকে যারা স্বীকারোক্তি নিত তাদেরকে স্টালিন বলত, There is a man, there is a problem. No men no problem. সরকার স্টালিনের অনুসরণ করে যাকে ইচ্ছা তাকে হত্যা করছে, গুম করছে। বিরোধী দলও হত্যা, লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ করছে। সরকারের পতন ঘটাতে দেশকে অচল ও পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য হরতাল আহ্বান করছে। অথচ একদিনের হরতালে দেশের অর্থনীতিতে দেড় হাযার কোটি টাকার ক্ষতি। বিজিএমই-এর তথ্য মতে, একদিনের হরতালে পোষাক খাতে ক্ষতির পরিমাণ ১৪০ কোটি টাকা । পরিবহন মালিকদের মতে, গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় ১ দিনের হরতালে কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। ২-৩ মাসের চলমান সহিংসতায় স্থানীয় সরকারে ক্ষতি হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। ২৫ উপযেলায় ৩৫ সরকারী দপ্তরে ভাঙচুর ও আগুনে ১০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। ১০টি সরকারী গাড়ীতে আগুন ও ভাঙচুর করা হয়েছে। গাছ কেটে ও রাস্তা খনন করে ২০ কোটি টাকার বেশী ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১২৯টি যানবাহন এবং ৩৭টি হয়েছে ভস্মিভূত। ফলে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। ডিসিসিআই সভাপতি আব্দুছ ছবুর খান বলেন, '১৫ দিনের হরতালে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তা দিয়ে আনায়াসে একটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব'। দেশের এত ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও সরকার তার আসনকে স্থায়ী রাখার জন্য বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের উপর যুলুম, নির্যাতন ও গ্রেফতার অব্যাহত রেখেছে। ঠিক বিরোধী দলও হিংস্র ও মারমুখী হয়ে উঠেছে। আসলে তারা কেউ দেশের উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করে না। দেশকে তারা নিজেদের ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে। তাই দেশ আজ রসাতলের দিকে ক্রমান্বয়ে ধাবমান।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সহিংসতা

শিক্ষা ক্ষেত্রে সহিংসতা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। সেখানে ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির অনুকরণে যুক্ত করা হয়েছে যৌনতামূলক আলোচনা। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে শিশুদের দেওয়া হয়েছে যৌনতার কুৎসিত ধারণা। ৮ম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা পড়াতে গিয়ে শিক্ষকরা বিব্রতবোধ করছেন। অন্য দিকে ৯ম শ্রেণীর 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ে উল্লেখিত হয়েছে 'দেব-দেবী বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে উৎসর্গকৃত পশুর মাংস খাওয়া হারাম' *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অথচ আল্লাহ্‌র সাথে দেব-দেবীর তুলনা করা জঘন্যতম শিরক। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বস্তুবাদী শিক্ষা দেওয়ার কারণে একের পর এক ছাত্রহত্যা, অপহরণ, যৌন হয়রানি, ছাত্র কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ নষ্ট, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ছাত্র সহিংসতা সর্বদা বিরাজ করছে। ফলে পরিমল, চন্দলা কুমার পোদ্দারের মত লম্পটরা আমাদের শিক্ষক হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছেন! ধর্ষণের সেঞ্চুরি করা মানিক আমাদের সুযোগ্য ছাত্র! আফসোস! বড়ই আফসোস!! যারা আমাদের সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিবে তারা যদি ধর্ষক হয় এবং রক্ষক যদি ভক্ষকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয় তাহলে তাদের কাছ কি আশা করা যায়? এই প্রকৃতির কুলাঙ্গার শিক্ষক এবং ছাত্রের জন্য শিক্ষার সকল পর্যায়ে আদর্শবান শিক্ষক ও ছাত্ররা বিব্রত ও লজ্জিত। ৪-৫ বছরের শিশু পর্যন্ত আজ পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে নিরাপদ নয়। অথচ ছাহাবীদের যুগে একজন নারী একাকী 'হেরা' থেকে মক্কায় গিয়েছে ও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষে পুনরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপদে ফিরে এসেছে *(বুখারী, মিশকাত, হা/৫৮৫৭)*। অতএব বস্তুবাদী শিক্ষার পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা তথা রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে তার নেতৃত্ব মেনে নিলেই আমরা নিরাপদে থাকতে পারব ইনশাআল্লাহ!

স্বার্থবাদী নেতৃত্বের কুৎসিত আপোষকামিতা

মানুষ তার কার্যক্রম যতই গোপনে বা নির্জনে করুক না কেন সময়ের ব্যবধানে সত্য তার স্বকীয়তা বা নিজস্ব অবয়বে উন্মোচিত হবেই। বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বৈশিষ্ট্য হ'ল স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হেন কিছু নেই যা তারা করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আজকে মতিয়া চৌধুরী, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন হলেন বর্তমান সরকারে পরম বন্ধু ও অভিভাবক সদৃশ। তারা একই মঞ্চে বসে দেশ চালাচ্ছেন। আর জামায়াত হল সরকারের চরম শত্রু। অথচ একসময় জাসদের হাযার হাযার তরুণকে বঙ্গবন্ধুর রক্ষীবাহিনী হত্যা করেছিল। এক সময়ের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে গণবাহিনী সৃষ্টি করে বহু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে যার হাত রক্তাক্ত হয়ে আছে সেই হাসানুল হক্ব ইনু এখন আওয়ামীলীগের কর্ণধার। আজকের কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ১৯৭৩ সালে বায়তুল মোকাররমের এক জনসভায় বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব'। যারা গোপনে বঙ্গবন্ধুর শত্রু বা বৈরী ছিল এখন তারাই আওয়ামী সরকারের সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও কাছের মানুষ।

গত ১৫ বছর পূর্বেও জামায়াত ছিল আওয়ামী লীগের সুহৃদ বন্ধু। ১৯৮৬ সালে এরশাদের পাতানো নির্বাচনে বিএনপিকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত একসঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনে শরীক হয়। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সরকার গঠনে জামায়াত বিএনপিকে সমর্থন দিলে তাদের উপর আওয়ামী লীগ ক্ষুব্ধ হয়। ১৯৯২ সালে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠন করে গোলাম আযমের ফাঁসির দাবীতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে গণ আদালত বসে। এ কারণে বিএনপি সরকার যখন গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে বসে। তখন বিএনপির উপর জামায়াত ক্ষুব্ধ হয়। অতঃপর ১৯৯৬ সালে বিএনপির বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জামায়াত ও আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনা গোলাম আযমকে তসবীহ, জায়নামায ও কুরআন শরীফ উপহার দিয়ে দো'আ নেন। এই হল আমাদের সেক্যুলার ও ইসলামী রাজনীতির কর্ণধারদের চরিত্র!

১৯৯৬ সালে বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টি যুগপৎভাবে আন্দোলনের নামে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিএনপির পতন ঘটায়। সময়ের বিবর্তনে সেই জামায়াত আজকে বিএনপির প্রাণের বন্ধু আর আওয়ামী লীগের শত্রু। সে শত্রুতা এমনই যে আওয়ামী লীগ জামায়াত নেতাদের একে একে ফাঁসিতে ঝোলানোর আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে। কাজেই চলমান রাজনীতি হল সঙ্গে থাকলে সঙ্গী আর বিরোধী হলে জঙ্গী। ফলে সঙ্গীকে রক্ষা করতে এবং জঙ্গী অর্থাৎ বিরোধীকে দমন করতে মাঠে নেমেছে রাজনৈতিক নেতা নামধারী গুণ্ডারা। এই নেতৃত্বের চরিত্রহীনতা ও আপোষকামিতার হাতে বন্দী দিশেহারা মানুষ দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে পড়েছে। দেশে আইনের কোন শাসন নেই। চলছে জঙ্গলের শাসন। 'জোর যার মুল্লুক তার'। আছে শুধু নেতা ও দলের মনগড়া আইন। দেশের কল্যাণে-অকল্যাণে যেন তাদের কোনই যায় আসে না।

শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চের উন্নাসিক নেতৃত্ব

বাংলাদেশে চালবাজী নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় নতুন মাত্রা যোগ করল শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের নেতৃত্ব। জামায়াত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি না হওয়ায় এ বছর ফেব্রুয়ারীর ৫ তারিখে যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চের কার্যক্রম শুরু হল। তারা শুরু করল আপাদমস্তক মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসা।

Contents

হঠাৎ করেই তারা মিডিয়ায় আবির্ভূত হল জাতীয় চেতনার প্রতীক হিসাবে। মাসাধিককাল ব্যাপী মিডিয়া তাদেরকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে একেবারে বাজিমাত করে দিল। বাংলাদেশে নাকি এবার তথাকথিত আম জনগণের নেতৃত্ব শুরু হতে যাচ্ছে। বেলুন, মোমবাতির ছেলেখেলা প্রোগ্রাম নিয়ে তাদের কি আস্ফালন!! বাংলাদেশকে নাকি এবার তারা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ দেবে!! তারপর? এদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেল। কথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির আড়ালে তারা একশ্রেণীর নাস্তিক ধর্মদ্রোহী ব্লগার যুবকদের হাত দিয়ে যে স্বয়ং ইসলামকে এ দেশের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা থেকে চিরতরে উচ্ছেদের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে–তা প্রমাণিত হয়ে যায়। শাহবাগীদের অন্যতম উদ্যোক্তা রাজীব হায়দার, আসিফ মহিউদ্দীন, আশরাফুল ইসলাম রাতুল ও নিঝুম মজুমদার শোভনসহ প্রভৃতি স্বঘোষিত নাস্তিকরা বিভিন্ন ব্লগে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে চরম অবমাননাকর লেখা ও মন্তব্য করে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। সাথে সাথে নারী-পুরুষের প্রকাশ্য মেলামেশা, উদ্দাম নৃত্য, অবাধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, মদ, গাজা ইত্যাদি অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে শাহবাগ চত্বরে। মুসলমাদের ফরজ বিধান পর্দাকে কটাক্ষ করে 'হোটেলের পতিতার' পোশাক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্যদিকে শাহবাগ মঞ্চ থেকে ওলামা-মাশায়েখদের জঙ্গী মৌলবাদী ও জারজ সন্তান বলে গালি দেয়া হয়েছে। দ্বীন ইসলামের বিরোধিতার প্রতীক এই শাহবাগের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা তো নেয়ই নি, বরং বিভিন্নভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতাই করেছে। বিলম্বিত পর্যায়ে দু'একটি লোক দেখানো পদক্ষেপ কেবল গ্রহণ করেছে। যেখানে ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনাকারীদের একদিনের মধ্যে গ্রেফতার করার কৃতিত্ব রয়েছে, জনাব মহীউদ্দীন খান আলমগীর স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানী হানাদারদের দোসর ছিল, এই ধ্রুব সত্য বলায় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীকে কোর্টে যেতে হয়েছে, সেখানে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামকে অপমান করার কারণে তারা শাহবাগে জামাই আদর পায়। ধিক! এই সরকার ও তার বিবেকহীন নেতৃত্বের। গণমানুষের মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে- কোন সরকার দেশ চালাচ্ছে? এ দেশের প্রধানমন্ত্রী নাকি শাহবাগ মঞ্চের নাস্তিক্যবাদীরা? কারণ একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার থাকা অবস্থায় গণজাগরণ মঞ্চের নির্দেশে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী অফিস আদালত বাড়িঘরসহ সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হচ্ছে ও তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থাকছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা জাগরণ মঞ্চের নির্দেশে নীরবতা পালনসহ সব কর্মসূচী পালন করছে। আজকে জামায়াতকে গালি দিতে গিয়ে কটাক্ষ করা হচ্ছে ইসলামকে। ফলে জনগণ অচিরেই এই হঠাৎ অধীশ্বর হয়ে বসা নেতৃত্বকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। তাদের নিদারুণ হিংসাবাণে অতিষ্ঠ হয়ে ব্যাকুলভাবে সন্ধান করেছে ইসলামের নিঃস্বার্থ সেবায় এগিয়ে আসা কোন শক্তির। ফলে ৬ই মার্চে শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলামী যখন সম্মেলন আহ্বান করল, তখন সারাদেশের ইসলামপ্রেমী জনতা প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে ও শাহবাগীদের ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণার বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করতে ছুটে গেল ঢাকার দিকে। কোন বাঁধাই তাদেরকে আর আটকিয়ে রাখতে পারল না। এভাবেই পতন ঘটল শাহবাগের সদম্ভ হুংকারের। মিইয়ে গেল মাটির সাথে তাদের যতসব হিংস্র আস্ফালন। সত্যিই যখনই ইসলাম আপন শক্তিতে দাঁড়িয়ে যায়, তখন পৃথিবীর কোন শক্তি নেই তাকে পরাজিত করবার। তাইতো ইসলামের বিজয় নিশান দেখে সভয়ে, সশ্রদ্ধচিত্তে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোমের অধিবাসীকে ডেকে বলেছিলেন, يَا مَعْشَرَ الرُّوم هَلْ لَكُمْ فِى الْفَلاَحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِىَّ 'হে রোমের অধিবাসী! তোমরা কি মঙ্গল ও সুপথ চাও? তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও? তাহলে এই নবী (মুহাম্মাদ ছাঃ)-এর বায়'য়াত গ্রহণ কর' (*ছহীহ বুখারী হা/৭ ও ৪৫৫৩*)।

অনুসরণীয় নেতৃত্ব

মেয়াদী দলতন্ত্রের হুতাশনে দেশ আজ রক্তাক্ত। একে অন্যের সাথে রক্তের হোলি খেলায় মত্ত। সমাধানের পথ যেন কারো জানা নেই। হতাশাগ্রস্ত, আতংকিত সাধারণ মানুষ তাই শান্তির জন্য আজ আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী যালেম শাসকগণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক ও সাহার্যকারী পাঠাও' (*নিসা ৭৫*)। এমন একজন অভিভাবক ও সাহায্যকারী যিনি আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে আদর্শিত করবেন। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে উত্তম আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' (*আহযাব ২৫*)। আল্লাহ্র এই ঘোষণার পরিপেক্ষিতে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে ছাহাবাগণ মনে প্রাণে, বিশ্বাসে ও কর্মে বাস্তবায়ন করার ফলে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এই আদর্শ গ্রহণ করার পূর্বে সেখানে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্বত্রই চলছিল শুধু অশান্তি, অপশাসন, অন্যায়-অত্যাচার, হানাহানি, মিথ্যা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির জয়জয়কার। Might is Right ছিল যার মূল শ্লোগান। অবশেষে ইসলামকে খুঁজে পাবার মাধ্যমে তারা এমন একটি আদর্শের অনুসারী হতে সক্ষম হয়েছিল, যে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁরা নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সংকুচিত হয়নি। হযরত খুবাইব (রাঃ) যখন শূলদণ্ড প্রাপ্ত হলেন। শাহাদৎ বরণ করে জান্নাতের অমীয় সুধা পানের অপেক্ষা করছেন। ঠিক তার পূর্বে দ্ব্যর্থহীনভাবে বজ্রকঠিন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, فَلَسْتُ أُبَالِى حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَىِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّه مَصْرَعِى وَذَلِكَ فِى ذَاتِ الإِلَه وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ 'যেহেতু আমি মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন শঙ্কা নেই। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যেকোন পার্শ্বে আমি ঢলে পড়ি। আমি যেহেতু আল্লাহ্র পথেই মৃত্যুবরণ করছি তাই ইচ্ছা করলে, আল্লাহ আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন' (*ছহীহ বুখরী হা/৩৯৮৯; মুসনাদে আহমাদ হা/৭৯১৫*)।

সেই তথাকথিত 'মধ্যযুগে' তারা এমন এক সভ্যতম সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, যেখানে যাকাত গ্রহণ করার মত একজন ব্যক্তির সন্ধানও পাওয়া ছিল দুষ্কর। সুতরাং বিশ্বশান্তির পথ খুঁজতে হলে আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধান এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। মানুষ যদি এই আর্দশ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তাহলে সমগ্র বিশ্ব আবারও ইসলামের দিগ্বিজয়ী আদর্শের নিকটে মাথা নত করতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। যে আদর্শের কাছে বিশ্বের প্রতাপশালী শাসক নমরুদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন, হামান, আবু জেহেল, আবু লাহাবের দাপট খর্ব হয়েছে। যে আদর্শের পদচম্বুন করেছে রূম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মত পরাশক্তিরা।

অতএব অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নেতৃত্বই দেখাতে পারে আমাদেরকে আশার আলো। কারণ এই অভ্রান্ত সত্যই মানব জাতিকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। তাইতো খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ান বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন পৃথিবীর সমস্ত দেশের জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষকে কুরআনের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কারণ একমাত্র পবিত্র কুরআনের নীতিগুলোই সত্য যা মানবজাতিকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে'। পরিশেষে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই হেরাক্লিয়াসের সেই উদাত্ত আহ্বান, আপনারা যদি কল্যাণ ও সত্যের পথে পরিচালিত হতে চান, যদি এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে চান তাহ'লে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নেতৃত্ব মেনে নিন এবং তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবন ও সমাজ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!!

[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

ইসলামবিদ্বেষী ডাচ রাজনীতিবিদের অবশেষে ফেরা

- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

['শেষ পর্যন্ত ইসলামই গ্রহণ করে ফেললেন আর্নোড ভ্যান ডুর্ন (Arnoud Van Doorn) (৪৬)। তাঁর টুইটার পেজে এখন শোভা পাচ্ছে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তিনি হঠাৎ করেই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। নেদারল্যাণ্ডের ইসলামবিদ্বেষী ডানপন্থী রাজনৈতিক দল 'পিভিভি'-এর সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এই ডাচ পার্লামেন্টারিয়ান ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় তোলা ১৭ মিনিটের প্রবল ইসলাম বিদ্বেষী তথ্যচিত্র 'ফিৎনা' নির্মাণকারী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইউরোপ জুড়ে ইসলামের বিস্তারে উদ্বিগ্ন হয়ে এই কুখ্যাত তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করা হয়। এর প্রতিবাদে সারাবিশ্বে মুসলমানরা যে ক্ষুব্ধ ও আবেগী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তা-ই তাকে ইসলাম নিয়ে আগ্রহী করে তোলে। অবশেষে ইসলাম ও রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন সম্পর্কে প্রায় বছরখানিক পড়াশোনার পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। এক বছর পূর্বেই তিনি স্বীয় পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন এবং হেগের সিটি হলে একজন পরামর্শক হিসাবে যোগদান করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হেগের মেয়রের নিকট স্বীয় চাকুরীস্থলে ছালাতের জন্য বিরতি চেয়ে আবেদন করেন। গত ২১ এপ্রিল তিনি মক্কায় উমরা হজ্জ পালন করেন এবং মক্কা ও মদীনার প্রখ্যাত আলেম-ওলামাগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, মিডিয়ার কারণে ইউরোপীয়রা ইসলামের সঠিক চিত্রটি জানতে পারে না। যদি তারা জানত যে, ইসলাম ধর্ম কত মাধুর্যময় ও বিজ্ঞতাপূর্ণ, তাহলে তারা প্রত্যেকেই ইসলামগ্রহণ করতে বাধ্য হত। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তাঁর নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে দেয়া হল-নির্বাহী সম্পাদক]

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি বলুন। কিভাবে আপনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেন?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : আমি কৌতূহলবশত কুরআন পড়া শুরু করেছিলাম ১ বছর পূর্বে। এর আগে ইসলাম সম্পর্কে কেবল নেতিবাচক গল্পই শুনে এসেছিলাম। কিন্তু কুরআন এবং সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ আমি যতই পড়তে লাগলাম, বুঝতে শুরু করলাম ইসলাম বাস্তবিকই কত সুন্দর ও বিচক্ষণতাপূর্ণ। খৃষ্টান হিসাবে পূর্ব থেকেই ধর্মীয় জ্ঞান আমার যথেষ্ট ছিল। তাই নৈতিক মূল্যবোধের দিক থেকে আমি ছিলাম খুব দৃঢ়। আমার তো মনে হয় একজন অবিশ্বাসীর চেয়ে একজন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীর জন্য ইসলাম গ্রহণ করা অধিকতর সহজ। কেননা নবী, ফেরেশতা এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের একটা প্রাকধারণা থাকে।

প্রশ্ন : ইতিপূর্বে আপনি একটি সুপরিচিত ইসলাম বিদ্বেষী দলের সদস্য ছিলেন। এমনকি আপনার দলের নির্দেশনায় রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা করে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে যেটা মনে হয়েছে যে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের সঠিক কোন জ্ঞান নেই। এতদসত্ত্বেও কি কারণে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন একটি পদক্ষেপ নিল?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : আমি আসলে কখনই কট্টর ডানপন্থী ছিলাম না। এমনিতে অন্যান্য অনেক মানুষের মত মুসলমানদের সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট বাজে ধারণা ছিল। যেমন– তারা হল ধর্মান্ধ, নারী নির্যাতনকারী, অসহিষ্ণু, পশ্চিমাবিদ্বেষী, উগ্র ইত্যাদি। আমার পার্টির সদস্যরা মানুষ হিসাবে খুব বন্ধুবাৎসল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অর্থনীতি এবং চলমান অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে আমার পার্টির সমালোচনাগুলো আমার কাছে খুব যুক্তিগ্রাহ্য ছিল। কিন্তু ইসলাম ও আরব বিশ্ব সম্পর্কে যে নেতিবাচক মনোভাব আমার দল পোষণ করত, তা সত্যিই অবর্ণনীয়। কোন বাছ-বিচার ছাড়াই নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে তারা কলংকিতভাবে চিত্রিত করত। আর এভাবে ভীতির সঞ্চার করে এবং মেরুকরণ করে মানুষকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা খুব সহজ। কারণ এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জাত্যাভিমান, একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্ব জাগ্রত হয়।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার প্রতি আপনার প্রাক্তন দলীয় সহকর্মীদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : আসলে গত বছর পার্টি ছাড়ার পর থেকে তাদের সাথে আর যোগাযোগ রাখিনি। তাই তাদের প্রতিক্রিয়াও জানতে পারিনি। আর মূলতঃ যারা 'পিভিভি" থেকে পদত্যাগ করে তাদেরকে এক প্রকার 'অস্তিত্বহীন' হিসাবে গণ্য করা হয়। এজন্য আমার প্রাক্তন সহকর্মীরা আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে ভয়ও পান। এতে পার্টিতে তাদের অবস্থান হুমকির মুখে পড়তে পারে।

প্রশ্ন : আপনি কি এখন অনুতাপ বোধ করেন এমন একটি দলের সদস্য হয়েছিলেন বলে?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : না, কারণ আমি এটাই শিখেছি যে, জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা অর্জনের পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। যাইহোক, এর মাধ্যমে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তার বদৌলতেই তো আজ আমি সন্দেহহীন চিত্তে এমন একটি ভিন্নধর্মী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি।

প্রশ্ন : সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : কোন কোন মানুষের চোখে আমি একজন বিশ্বাসঘাতক। তবে অধিকাংশই মনে করে যে আমি খুব ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সর্বোপরি সাধারণভাবে মানুষের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচকই ছিল। আর আমার টুইটার পেজেও মানুষের কাছ থেকে

খুব সমর্থন পেয়েছি। এটা খুব ভাল লাগছিল যে, যে সব মানুষ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না, তারাও আমার অবস্থানটি বুঝতে পেরেছেন এবং আমার সিদ্ধান্তে সমর্থন জুগিয়েছেন।

প্রশ্ন : যদি কোন অমুসলিমের কাছে আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে বলা হয়, তবে কোন বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করবেন?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : আমি আগেই বলেছি, ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করুন। নিজেকে পক্ষপাতিত্ব মুক্ত করুন। তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে দেখতে পাবেন যে, ইসলাম সত্যিই মহান ইতিহাসসমৃদ্ধ এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুন্দর ও বিশুদ্ধতম একটি ধর্ম। আমরা এখানে পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধা ভাগাভাগি করি। এই ধর্ম আপনাকে আত্মিক প্রশান্তি আর প্রজ্ঞা দিয়ে সমুন্নত করবে, বিকশিত করবে। আপনার আধ্যাত্মিক জীবনকে আরো সুগভীর করবে। পশ্চিমাদের চোখে সাফল্যের সাধারণ যে উপকরণ তথা অর্থ ও বস্তুবাদ; তার চেয়ে জীবনের প্রকৃত মর্মার্থ আরো অনেক গভীর। মুসলিম হওয়ার মাধ্যমে তাই আপনি আরো বলিষ্ঠ ও উত্তম মানুষে পরিণত হবেন।

প্রশ্ন : পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামকে জঙ্গীবাদ, মানবাধিবার লংঘন ও নারীর প্রতি অসদাচরণ সংক্রান্ত সমস্যা বিস্তারের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। এ সব অভিযোগের ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : আমি আবারও বলছি এসব পক্ষপাতদুষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয় অজ্ঞতার কারণে। পৃথিবীর যে কোন ধর্মেই উগ্র ও চরমপন্থী রয়েছে। এদের সংখ্যা মাত্র ১%। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ১% চরমপন্থীর কথা টিভি ও অন্যান্য গণমাধ্যমে খুব ফলাও করে প্রচারিত হয় এবং অনেক বড় করে দেখানো হয়। বাকি ৯৯% মুসলিম যারা কঠোর পরিশ্রমী ও শান্তিকামী তারা রয়ে যায় আড়ালে। মূলতঃ সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে একজন যতই পড়াশোনা করবে, ততই সে তার মধ্যে সৌন্দর্যের আঁধার খুঁজে পাবে।

প্রশ্ন : বর্তমানে নাস্তিকতার প্রসারে যত সব প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তার পিছনে কারণ কি? আর যারা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে ভুগছে তাদের প্রতি আপনার উপদেশ কি?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : আমার কেবলই মনে হয় প্রভাবশালী পশ্চিমারা এবং অধিকাংশ রাজনীতিবিদরা ধর্মের কোন প্রভাবকে পছন্দ করতে পারেন না। আর বিশ্বাস বা ধর্মের উপর টিকে আছে এমন মানুষের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে খুব কমই। বেশীরভাগই অর্থোপার্জন, ভোগবাদিতা আর জাগতিক উন্নতিকে একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করে চলেছে। পশ্চিমা শিল্পপতিরা মূলতঃ চায় জনগণ আত্মিক শক্তি অর্জনের পথ থেকে সরে এসে ভোগমুখী হোক। তাদের মতে, 'সম্পদ ব্যয় এবং ভোগ'ই সকল সুখের মানদণ্ড। কিন্তু বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণরা আত্মিকভাবে শক্তিশালী হয় এবং বস্তুবাদী বিষয়াদির উপর কম নির্ভর করে। তাই রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য প্রভাবশালী মহল কখনই চায় না যে মানুষ তাদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে অধিকতর আত্মনির্ভর হোক এবং নিজেদের অন্তর্জগতকে বলিষ্ঠ করে তুলুক। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঘেরাটোপে আটকে থাকা সংশয়বাদীদের উদ্দেশ্যেও আমি এই কথাটিই বলব।

প্রশ্ন : যে সব লোক আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে এখনও সন্দিহান তাদের ব্যাপারে কি বলবেন?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : আমি বুঝতে পারছি অনেকেই এ ব্যাপারে সন্দিহান। কেননা অনেকের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত। তবে যারা আমার কাছাকাছি থাকেন তারা জানেন আমি গত এক বছর থেকেই কুরআন, হাদীছ এবং অন্যান্য ইসলামী বইসমূহ নিয়ে গবেষণা করছি। একই সাথে আমি মুসলমানদের সঙ্গে অনেকবারই ধর্ম নিয়ে আলোচনায় বসেছি। সুতরাং এটা অনেক বড় একটা সিদ্ধান্ত। আমি মোটেও এটা হালকাভাবে গ্রহণ করিনি।

প্রশ্ন : আপনি কি আর কিছু বলতে চান?

আর্নোড ভ্যান ডুর্ন : অনেকের মত আমিও জীবনে অনেক ভুল করেছি। এ সব ভুল থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তবে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার অনুভূতি হল আমি অবশেষে আমার পথ খুঁজে পেয়েছি। আমি উপলব্ধি করছি যে, এটা আমার জীবনে এক নব দিগন্তের সূচনা এবং আমার আরো বহু কিছু শেখার আছে। আমি জানি আমাকে আরো অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে, বিশেষতঃ কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু আমি দৃঢ় বিশ্বাসী আল্লাহ সেই মুহূর্তগুলোতে আমাকে সাহায্য করবেন এবং সঠিক পথ দেখাবেন।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে দীর্ঘদিন পর নতুন অবয়বে যাত্রা শুরু করেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-নির্বাহী সম্পাদক

দালান ধসের বিজ্ঞান

শরীফ আবু হায়াত অপু
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১.

রানা প্লাজার উচ্চতা ছিলো নয় তলা। এখন বড় জোর তিন তলা। ছাদগুলো আলিঙ্গন করেছে একে অপরকে। মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই, আছে কেবল মেশিন, কাপড়, জঞ্জাল আর মানুষ। মরা মানুষ, জ্যান্ত মানুষ। হঠাৎ হল্লা, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে একটি দেহ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে টর্চের আলো জ্বেলে এদিক ওদিক ঘুরছি। যদি কিছু করা যায়। 'জক' লাগবে—চিৎকার শুনে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ছাদের উপরে আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিলাম 'জক'টা। দুটো স্টিলের টিফিন বাটিতে ভাত পড়ে আছে একখানে। একটু পাশে একটা দেয়ালের ফাঁকা দিয়ে একটা লাশ দেখা যাচ্ছে। তার গলার উপরে একটা পাইপ। পাশে আরেকটা মেয়ে বসা। সেও মৃত। কংক্রিট কাটছে দমকলের মানুষরা। এলাকার ছেলেরা কাঁধ পেতে বের করছে লাশ। কানে এল কথা গুলো, 'হাতটা কেটে ফেল তাহলে বের করা যাবে।' একজন চিৎকার করে জানালো—ভাই ওখান থেকে সরে যান, নীচে ইট পড়ছে। বুঝলাম কোন কাজে আসছি না। বেরিয়ে এলাম।

একটা হাসপাতালে ঢুকলাম। কিছু আহত সেখানে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন? মুখের ভেতরে কেটে গেছে। কথা বলতে পারল না। গোঁফের রেখা ওঠেনি এমন একটা ছেলে এল জরুরী বিভাগে। কতই বা বয়স? ১৪, ১৫? হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখি মধ্যবয়সী একটা লোক হাটুতে মুখ বুঁজে কাঁদছে। পাশের মানুষটি সান্তনা দিচ্ছে। কাঁদিস না, খুঁজে পাবি।

অধরচন্দ্র স্কুল। বনেদি আমলের বিশাল লম্বা বারান্দা। সারি সারি লাশ। মানুষজন লাইন ধরেছে। হেটে যাচ্ছে বারান্দা ধরে। প্রিয়জনের মুখটা চিনতে পারলে ডুকরে কেঁদে উঠছে। নাহ, এত লম্বা বারান্দাতেও ধরেনি সব লাশ। মাঠেও লাশের মিছিল। ধূলায় ধুসরিত লাশ। রক্তমাখা, চেপ্টে যাওয়া মুখগুলো ঢেকে দেওয়া কাপড়ে।

২.

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য কী? মৃত্যু। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপেক্ষিত সত্যও তাই। সাভারের ঘটনা দেখে আমাদের অনেকের অনেক কিছু মনে হয়েছে। মনে হয়নি কেবল আমার নিজের মৃত্যুর কথা। আমরা লোক দেখানো শোক প্রকাশ করি। পতাকা নামিয়ে রাখি। ভবন মালিকের চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করি। চোখ-মুখ শক্ত করে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। এরপরে কালো ব্যাজ সহই লঘু ঠাট্টায় মেতে উঠি। পত্রিকায় পড়ি অকাল মৃত্যু। মৃত্যু অকাল হয় না। আগের দিন বিশ জন আহত হয়েছিল ভবন ছেড়ে পালাতে গিয়ে, সে দালানেই মানুষগুলোকে ঢোকানো হয়েছে। অনেকের মৃত্যু লেখা ছিল। যাদের লেখা ছিল না, তারা বেঁচে গেছে। আল্লাহর অভিধানে অকাল বলে কিছু নেই, সব কিছু মিনিট-সেকেন্ড অবধি হিসেব করা আছে। অসময়ে মৃত্যু কথাটা আমাদের আবিষ্কার। আমরা যা পছন্দ করিনা তাকে ঠেলে দেই দূরে। আমি ভুলে থাকলেই মৃত্যু আমাকে ভুলে যাবে এমনটি নয়। আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে সে আসবে। যেখানে আমার মরার কথা, সেখানে আমি নিজেই যাব। কথাগুলো আল্লাহ আমাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি না। যখন আল্লাহ আমাদের উদাহরণসহ শিক্ষা দেন আমরা জিহবা দিয়ে তু তু তু শব্দ করি। আসলে যে এ ঘটনাগুলো আমাদের জন্য শিক্ষা সেটা বুঝতেও পারি না।

৩.

সাভারে মৃতের সংখ্যা প্রায় বার'শ ছুঁয়েছে। আহত হাজারেরও বেশি। এ ধরণের যেসব বিপর্যয় প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে স্পর্শ করছে তা মানুষের হাতের কামাই। মানুষের লোভের ফলাফল। জানা লোভ, অজানা লোভ। বিশ্বায়নের এ যুগে শুধু হীরে বা ওষুধ নয়, কাপড়েও মিশে আছে রক্ত।

একটি রপ্তানী সমিতির দাবী অনুসারে বাংলাদেশে অন্তত ৯০টি প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড নাইকির জন্য কাপড় তৈরি করে। নাইকির তৈরি বার্সেলোনার একটি রেপ্লিকার জার্সির দাম ৮৫ ডলার। এটি তৈরি করতে আসলে কত খরচ হয়? নাইকির এক কর্তা বাবু যাকে বনানীতে বিকেলে সাইকেল চালাতে দেখা যায়, তিনি হিসেব করে দেখলেন জার্সিটির দাম পড়ে ২০০ টাকা। ন্যুনতম মজুরি ৩,০০০ টাকা ধরেই। এখন আপনি-আমি মোটা বুদ্ধিতে ভাবি ২০০ টাকা যদি মোট খরচ হয় তাহলে আড়াই শতাংশ লাভে গার্মেন্টস মালিক পাবে ২০৫ টাকা। কিন্তু লালমুখো সাহেব আমেরিকার আরাম ফেলে ভূ-নরক বাংলাদেশে তো আর সবরি কলা চাষ করতে আসেনি। সে বলবে ১৮০ টাকা। গার্মেন্টস মালিক যেই লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলবে হোয়াট? তখনই সাহেবের হাত চলে যাবে গার্মেন্টসটির কিছু ফাইলের দিকে। শ্রমিকদের কাজের অবস্থা অবর্ণনীয়। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা নেই। শিশু শ্রমিক আছে। সাহেব আরো লাল হয়ে বলবে, নাহ তোমাকে কাজটা দেওয়া যাবে না। আমাদের ব্র্যান্ডের সুনাম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। গার্মেন্টস মালিক বলবে আচ্ছা অন্তত ১৯০ টাকা দিও। টেবিলের উপরে পুমা ব্র্যান্ডের একজোড়া জুতা দেখা যাবে। চুক্তি সই করে বের হয়ে যাবার সময় মালিক ভাবতে থাকবে, শালা খবিস। রিয়েল এস্টেট এজেন্ট অটোয়াতে একটা ওয়াটারফ্রন্ট বাড়ি দেখিয়েছিল, এবারের টাকা দিয়ে সেটা কিনে ফেলার কথা ছিলো। যাইহোক, ন্যুনতম বেতন স্কেল নিয়ে আরো ছ'মাস গড়িমসি করতে হবে। পুরনো কিছু শ্রমিককে ছাটাই করতে হবে। ওভারটাইমের টাকা কমাতে হবে। মেরে হোক, পিটিয়ে হোক ঘন্টায় উৎপাদন ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ করতে হবে। একটা জার্সির দাম যেন ১৭৫ টাকা না পেরোয়। বাড়ি কেনা ঠেকায় কোন শালা!

ব্র্যান্ড বাদ দেই, যেই ওয়ালমার্টে আমেরিকার সব শ্রেণীর লোকেরা বাজার করে সেই ওয়ালমার্ট কী করে? মেইড ইন বাংলাদেশ ফ্লিস হুডির দাম ৮.৪৭ ডলার। পলওয়েলে একই জিনিস পাওয়া যায় দেড়শ টাকায়। একদম একই জিনিস। 'আমাদের নিজস্ব কোন কারখানা নেই, আমরা অন্যদের দিয়ে কাজ করাই। তবে আমাদের মূল ব্যবসা উৎপাদন খরচ কমানো'–বলেছিলেন ওয়ালমার্টের এক সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার। দাম কমালে মানুষ আসবেই আসবে। ঔচিত্যবোধ দিয়ে পেট চলে না, মাথা চলে পণ্যের দামের হিসেবে। ওয়ালমার্টের আবার অন্য বুদ্ধিও আছে। এরা পণ্যের দাম দেবে ৯০ দিন পরে, এই মর্মে আগেই চুক্তি করে নেয়। এর মধ্যে তারা কাপড় বিক্রি করে, ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ খায় নয়ত আবার অন্য কোন জায়গায় বিনিয়োগ করে। এই বাটপারিকালীন সময়ে গার্মেন্টসের শ্রমিকদের বেতন বকেয়া থেকে যায়। এ পৃথিবীতে বড়লোকদের চেয়ে ছোটলোক বোধকরি আর কেউ নেই। নাইকির মত ব্র্যান্ডগুলোর ব্যবসায় নীতিতে কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটির মতো গালভরা সব ব্যাপার আছে। সেখানে লেখাও আছে- While we neither owncontract factories nor employ their workers, we can influence their businesspractices–including wages– through our own sourcing and assessment processes.

কথা সত্য। প্রভাব বিস্তার সাহেবরা করে বটে! মাল্টি-ন্যাশনালরা ফিরিস্তি দেবে কত শতাংশ মজুরি বেড়েছে। তবে তারা বলবে না সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে মজুরি দরকার সেটা শ্রমিকেরা পায়

কিনা। কেউ জিজ্ঞেস করে উত্তর পাবে না যে ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকাতে ক'টা ব্র্যান্ডের ক'টা কাপড়, জুতা তৈরি হয়? কেন হয় না? ঠিক কোন মন্ত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শ্রমবাজার এত সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে?

এভাবেই প্রতিটি শ্রমিকদের দেহ থেকে একটি নল বেরিয়ে গেছে বড় আরেকটা নলে। সে নল থেকে রক্ত চুষে খাওয়ার সময় পুঁজিবাদি দেশের সাহেবরা কুলি করে কিছু রক্ত ফেলে দেয়। সিংহভাগ গার্মেন্টস মালিকদের খাবার সেই উচ্ছিষ্ট রক্ত। তবে উচ্ছিষ্ট বলে সেই রক্তের পুষ্টিগুণ কম নয়। আমেরিকা বা কানাডার সিটিজেন নয় এমন বাংলাদেশী গার্মেন্টস মালিকের সংখ্যা হাতেগোণা। ঢাকার তিন-চার-পাঁচ তারা হোটেলে মদের জোয়ার আর বাঈজিদের আড্ডা বসে। বিদেশি বায়ারদের সুধা-সঞ্জীবনী সমেত আপ্যায়ন করে বিজিএমইএ। ডেইলি স্টারে খবর আসে বাংলাদেশ এখন নামী-দামী সব ব্র্যান্ডের কাপড় বানায়। টমিহিল ফিগার, ডিজেল, রালফ লরেন, কেলভিন ক্লেইন, বেনেটন, ম্যাংগো...। হু হু, বাবা আমরা আর ফকিন্নিদের দেশ নই বুঝেছ? দেশ থেকে ফকিন্নির পুতদের দূর করার মহান ব্রতে যদি দুই একটা ভবন ধসে পড়ে কিইবা যায় আসে? শ্রমিকদের জীবন তো তুচ্ছ জিনিস, গার্মেন্টস মালিকরা যে দেশের সরকার, আইনকে দুই পয়সা দাম দেয় না, সেটা হাতিরঝিলের মাঝে বিজিএমইএ ভবন দেখে কি বোঝা যায় না?

রানা প্লাজা বাংলাদেশের একমাত্র ডোবা ভরাট করে বানানো দালান নয়। ক'টা দালানে পাইলিং হচ্ছে ঠিক মতো? জায়গা বাঁচাতে কলামের বেড় কমছে। সিমেন্ট জমাট বাঁধতে দেওয়ার মতো সময় নেই, কিউরিং করা তো দূরে থাক। এ সরকারের আমলেই কাজ শেষ করতে হবে। এসব ভবনে মুরগি পালা হলে এক কথা ছিল, এখানে গার্মেন্টসের ভারি মেশিনপত্র চলবে। মেশিনগুলোর নিজস্ব একটা ভাইব্রেশন আছে। ইঞ্জিনিয়াররা এসব হিসেব করার কথা মনেই রাখে না পকেটে টাকা এলে। কর্তৃপক্ষকে তাদের বখরা দিলে খুশি, কী রাজউক, কী পৌরসভা। সবাই চোখ বন্ধ করে সাধুবাবা হয়ে যাবে, পাঁচতলার জায়গা দশতলা উঠবে নিশ্চিন্তে।

এর সাথে আছে রাষ্ট্র। দুর্জনের তোষণ আর শিষ্টের দমন যার মূলনীতি। বিল্ডিং মালিক রানা সাহেবকে এলাকার এমপি মুরাদ জং নিজে এসে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মখা আলমগীর তত্ত্ব ঝেড়েছেন গেট, দেয়াল আর স্তম্ভ ধরে ঝাঁকি দেওয়া দালান ধসের সম্ভাব্য কারণ। রানা সাহেবের এতগুলো হাইরাইজের টাকার ভাগ কোন পর্যন্ত যায় সেটা বুঝতে কি কারো বাকি আছে?

৪.

এ পর্যন্ত যে ছবি আমরা দেখলাম তা খুবই ধূসর, বিষণ্ন। এই দুনিয়ায় আমরা টিকব কীভাবে? পৃথিবীতে লোভকে কেন্দ্র করে যত সমস্যা আছে তার সমাধান একটাই, আল্লাহকে রিযিকের মালিক বলে বিশ্বাস করা। কুরআন-সুন্নাহতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন রিযিক অর্থাৎ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু লাগে, টাকা-পয়সা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, মর্যাদা, দৈহিক শক্তি, মানসিক বুদ্ধি সবকিছু আল্লাহই বন্টন করেন। কাকে কতটুকু দেবেন সেটা পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহই রিযিক বাড়ান আবার কমান। এই বন্টন স্বেচ্ছাচারিতা নয়। রিযিক বাড়া-কমানোর বর্ণনার পরে আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দেন তিনি তার বান্দাদের খোজ-খবর রাখেন, তাদের তিনি দেখছেন। আল্লাহ জানেন কার চাহিদা কতটুকু। তিনি সেভাবেই রিযিক বাড়ান বা কমান।

আল্লাহ আর-রায্যাক–এ কথাটার মানে আসলে কী? যে শ্রমিক বোনটি সকালে বেগুন ভর্তা দিয়ে ভাত খেয়েছিল তার জন্য ঐ সকালে ঐ খাবারটিই লেখা ছিল। রানা সাহেব ফাটলকে পলেস্তারার খসে পড়া বলে চালিয়ে দুপুরে যে কাচ্চি বিরিয়ানি খেয়েছিল, তার কপালে সেটিই ছিল। তার মানে আমাদের সবার কপালে লেখা আছে আমরা কবে কখন কী খাব। আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন এভাবে যে আমাদের সামনে সেই একই খাবারটি খাওয়ার দুটো পন্থা আসবে, হালাল আর হারাম। আমরা যদি হালালটি নেই তাহলে আমরা মুক্তি পেয়ে গেলাম পরকালে। এই দুনিয়াতে আমাদের যা পাওয়ার কথা ছিলো তা কিন্তু একরত্তিও বদলাচ্ছে না। কিন্তু কেউ যদি পরকালকে তোয়াক্কা না করে, আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়াকে গ্রাহ্য না করে হারাম পথটি বেছে নেয়, তবে আল্লাহ তাকে তার ইহকালের বরাদ্দটুকু দেবেন বটে; কিন্তু পরকালে লাঞ্ছিত-অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

রানা সাহেব যদি রিযিকের ব্যাপারটা বুঝত, তাহলে ডোবা দখল করত না। ফাটলকে পলেস্তারার খসে পড়া বলত না। তার বরাদ্দ কাচ্চি সে ঠিকই পেত। কিন্তু আজ রানা সাহেব জাতীয় অপরাধী। সারাদেশের মানুষ তার মুখে থু থু ছিটাবে। তার সন্তানেরা বাবার পরিচয় দিতে লজ্জা পাবে আজীবন। শ্রমিক বোনটি যদি বুঝতেন, আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা, তিনি যা লিখে রেখেছেন তাই আসবে তাহলে কি তিনি কারখানায় শরীরে রক্ত বেচতেন? যে সংসারের আয় আল্লাহ বরাদ্দ রেখেছেন ৬০০০ টাকা সেখানে স্বামী একাকি বাইরে কাজ করুক আর স্বামী-স্ত্রী দুইজন মিলে কামাই করুক; বরাদ্দ ঐ ৬০০০ টাকাই!

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারা বলে বেড়ায় মোল্লারা মেয়েদের ঘরে বন্দী করতে চায়। আচ্ছা ঘর কি কয়েদখানা যে তাতে মানুষকে বন্দী করা চলে? নাকি কারাগার ঐ গার্মেন্টসটা যেখানে ঢুকতে বেরোতে হলে দশ জায়গায় অনুমতি নিতে হয়? নিজের ঘরে মেয়েরা বন্দী আর লম্পট মালিকের অফিস ঘরে মেয়েরা মুক্ত! দেহ বেয়ে শিশুদের খেলা বন্দীত্বের নিদর্শন, সিকিউরিটির হাত সেখানে খেলা না করা অবধি মেয়েদের মুক্তি নেই। এসব কথা আবার শিক্ষিত মানুষরা খায়ও বটে!

এ দেশে নারী শ্রমিকদের সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়েই গার্মেন্টস নামের শোষণ শিল্পটা দাঁড়িয়ে গেছে। হাত বাড়ালেই কর্মী পাওয়া না গেলে মালিকরা মুখের উপরে বলতে পারত না, ১৬৬২ টাকা বেতনে কাজ করলে করো নাহলে যাও। আল্লাহ মেয়েদের টাকা কামানোর যন্ত্র হিসেবে সৃষ্টি করেননি। মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বাবা, স্বামী, ভাই, সন্তান বাধ্য কাজ করে ঘরের মেয়েদের খাওয়াবে। বাইরের কাজ তো দূরের কথা ইমাম নববীর মতে, রান্না-বান্না, কাপড় কাঁচা, ধোয়া-মোছা—ইত্যাদি কাজও নারীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। নারীমুক্তির নামে মেয়েদের সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা কুকুরের মতো খাটানো থেকে পুঁজিবাদের কালো চেহারাটা স্পষ্ট হয়। মেয়েদের মুক্তির নামে ঘরের বাইরে আনো। শ্রমবাজার সস্তা করো। উৎপাদন খরচ কমাও। আর পুরুষদের বসে বসে মদ-গাজা খেয়ে পড়ে থাকার সুযোগ দাও। আমাদের এ ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে। শয়তানদের হাতে নিজেদের শোষণের জন্য তুলে দেব না আমরা।

মেয়েরা পড়াশোনা শিখবে ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে; শিক্ষার উদ্দেশ্য টাকা কামানো নয়। অর্থ ছাড়া কাজ অর্থহীন, এই বিশ্বাস মন থেকে সরাতে হবে। মেয়েরা পরিবারের জন্য কাজ করবে। এতে ভালোবাসা থাকবে। সমাজের জন্য কাজ করবে। ডাক্তার, শিক্ষিকা, দর্জি সবই হবে। এতে অর্থোপার্জন হতে পারে, কিন্তু সেটা মূখ্য নয়। যে বোঝা আল্লাহ মেয়েদের উপরে চাপিয়ে দেননি, সেটা জোর করে কাঁধে তুলে নেওয়াটা বোকামি।

আল্লাহ যে রিযিক বরাদ্দ করেছেন, তা আসবেই এটা বুঝলে গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিতেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা মেনে ঘাম শুকানোর আগেই দিতেন। বায়ারদের সামনে মিন মিন না করে স্পষ্ট বলতেন, দরে না পোষালে তোমার কাজ আমার না করলেও চলবে। দালান ধসে যারা মরেছে তারা যে মাটির কবরে গেছে, শিল্পপতিরা হার্ট এটাক করে ঐ একই কবরেই তো যাবে।

আমরা যেন আল্লাহকে একমাত্র রিযিকদাতা বলে চিনতে শিখি, মানতে শিখি, দুনিয়ার মোহ থেকে বের হতে শিখি। আল্লাহ যেন আমাদের লোভ থেকে, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

অমুসলিমদের যবানীতে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-২

অনুবাদ : আব্দুল হাসীব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১. প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক **বসওয়ার্থ স্মীথ** (১৮৩৯-১৯০৮) ৭ মার্চ ১৮৭৪ সালে লণ্ডনের রয়াল ইনিস্টিটিউশনে এক জনাকীর্ণ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালে রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলেন- 'Head of the State as well as of the Church, he was Caesar and Pope in one; but he was Pope without the Pope's pretensions, and Caesar without the legions of Caesar. Without a standing army, without a bodyguard, without a palace, without a fixed revenue, if ever any man had the right to say that he ruled by a right Divine, it was Mohammed; for he had all the power without its instruments and without its supports. He rose superior to the titles and ceremonies, the solemn trifling, and the proud humility of court etiquette. To hereditary kings, to princes born in the purple, these things are, naturally enough, as the breath of life; but those who ought to have known better, even self-made rulers, and those the foremost in the files of time — a Caesar, a Cromwell, a Napoleon — have been unable to resist their tinsel attractions. Mohammed was content with the reality, he cared not for the dressings, of power. The simplicity of his private life was in keeping with his public life *(Reginald Bosworth Smith, in "Mohammedanism and Christianity" (7 March 1874), published in Mohammed and Mohammedanism (1889), p. 289)*.

'তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনেতা এবং ধর্মনেতা। একই সাথে সিজার এবং পোপ; কিন্তু পোপের কোন জাঁকজমক ছাড়াই পোপ এবং সিজারের রাজকীয় বাহিনী ছাড়াই সিজার। কোন প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনী, দেহরক্ষী, রাজপ্রাসাদ কিংবা নির্ধারিত রাজস্বের ব্যবস্থাপনা না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তির যদি এ কথা বলার অধিকার থাকে যে, তিনি যথার্থই স্বর্গীয় আইন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন, তবে তিনি হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। কারণ ক্ষমতায় থাকার কোন উপায়-উপকরণ এবং মওজুদ উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। পদবী, আনুষ্ঠানিকতা, তুচ্ছ ভাবগাম্ভীর্য এবং রাজদরবারের বৈশিষ্টসূচক গর্বোদ্ধত বিনীতভাব থেকে তাঁর অবস্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। বংশানুক্রমিক রাজ-রাজড়া, রাজবংশের সন্তানদের নিকটে এসব বিষয় প্রাত্যহিক জীবনে নিঃশ্বাস গ্রহণের মতই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যারা সুখ্যাতি লাভ করেছেন, এমনকি সে সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ শাসকগণ এবং ইতিহাসের পাতায় যে সকল শাসকদের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় যেমন–সিজার, ক্রমওয়েল, নেপোলিওনরা; তারাও পর্যন্ত এসব জেল্লাদার, আকর্ষণীয় বিষয়-আশয়ের উচ্চাভিলাষ থেকে আত্মসংবরণ করতে সক্ষম হননি। মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন বাস্তববাদী পুরুষ। ক্ষমতার পোশাকী বাহাদুরী নিয়ে তাঁর কোন উদ্বেগ ছিল না। সামাজিক জীবনের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল একই রকম সারল্যে ভরপুর'।

> 'সন্দেহাতীতভাবে ইতিহাসের একমাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; যিনি একাধারে একটি জাতি, একটি রাষ্ট্র এবং একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।
> *-বসওয়ার্থ স্মীথ*

তিনি আরো বলেন, "By a fortune absolutely unique in history , Mohammed is a threefold founder of a nation, of an empire, and of a religion".

'সন্দেহাতীতভাবে ইতিহাসের একমাত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; যিনি একাধারে একটি জাতি, একটি রাষ্ট্র এবং একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

২- খ্যাতনামা স্কটিশ ঐতিহাসিক এবং এডিনবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এমিরেটাস অধ্যাপক **উইলিয়াম মন্টেগোমারী ওয়াট** (১৯০৯-২০০৬) বলেন, "His readiness to undergo persecutions for his beliefs, the high moral character of the men who believed in him and looked up to him as leader, and the greatness of his ultimate achievement - all argue his fundamental integrity. To suppose Muhammad an impostor raises more problems than it solves. Moreover, none of the great figures of history is so poorly appreciated in the West as Muhammad" *(William Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford : 1953, P. 52)*.

'আপন বিশ্বাস তথা ঈমান রক্ষার্থে তাঁর (মুহাম্মাদ ছাঃ-এর) যে কোন দুর্ভোগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকা এবং তাঁকে নবী হিসাবে বিশ্বাস স্থাপনকারী ও নেতা হিসেবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী মানুষদের মাঝে সুউচ্চ নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ এবং তাঁর চূড়ান্ত সাফল্যের মাঝে যে মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে–তা তাঁর মৌলিক সত্যশীলতার প্রতি সাক্ষ্য দেয়। তাই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে একজন কপট ব্যক্তি হিসেবে ধরে নিলে সমাধানের চেয়ে সমস্যাই বেশী তৈরী হবে। অধিকন্তু পশ্চিমা বিশ্বে ইতিহাসের কোন মহান ব্যক্তিকেই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মত এত অবহেলিতভাবে মূল্যায়িত হতে হয়নি'।

৩- ফ্রেঞ্চ লেখক, কবি এবং রাজনীতিবিদ **আলফনসে ডি লামার্টিন** (১৭৯০-১৮৬৯) বলেন "The founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammed. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he? *(Lamartine, Historie de la Turquie, Paris 1854, Vol. 11 pp. 276-277)*.

'বিশটি জাগতিক সাম্রাজ্য এবং একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের যিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। একজন মানুষের মহত্ত্বকে পরিমাপ করা যেতে পারে এমন সর্বপ্রকার মাপকাঠিতে বিচার করলে আমরা খুব যথার্থভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারি যে, পৃথিবীতে তার চেয়ে মহত্তর কোন মানুষ আর আছেন কি?

৪- বিখ্যাত আইরিশ ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক **জর্জ বার্নাড'শ** (১৮৫৬-১৯৫০) লিখেছেন, "I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him - the wonderful man and in my opinion for from being an anti-Christ, he must be called the Saviour of Humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness: I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today." *(George Bernard Shaw, The Genuine Islam Vol. 1, No. 8, 1936).*

'আমি যে সর্বদা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ধর্মকে উচ্চ দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করি। তার কারণ হল এ ধর্মের বিস্ময়কর জীবনীশক্তি। আমার নিকট এটাই একমাত্র ধর্ম যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে অঙ্গীভূত করে নেয়া বা খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। ফলে সকল যুগেই সমানভাবে তার আবেদন বজায় রাখতে পারে। আমি তাঁকে (রাসূল ছাঃ) খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি। একজন বিস্ময়কর মানুষ তিনি এবং আমার মতে তাঁকে এন্টি-ক্রাইস্ট বা যীশু-বিরোধী না বলে অবশ্যই আখ্যায়িত করা উচিৎ 'সেভিয়ার অব হিউম্যানিটি' বা 'মানবতার ত্রাণকর্তা' হিসেবে। আমি বিশ্বাস করি তাঁর মত একজন মানুষ যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়ক শাসক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান এমনভাবে করতেন যে, তা সেই অতি কাংখিত সুখ-শান্তি বয়ে নিয়ে আসত। আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছি যে, এটা আগামীর ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে যেমনিভাবে তা ইতিমধ্যেই বর্তমান ইউরোপে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে'।

তিনি আরও বলেন, "If any religion had the chance of ruling over England, nay Europe within the next hundred years, it could be Islam."

'যদি কোন ধর্ম আগামী ১০০ বছরের মধ্যে ইংল্যাণ্ড তথা সমগ্র ইউরোপ শাসন করার সুযোগ পায়, তবে সেটা হল ইসলাম'।

৫- বিশিষ্ট দার্শনিক ও লেখক **জন অস্টিন** লিখেছেন, "In little more than a year he was actually the spiritual, nominal and temporal ruler of Medina, with his hands on the lever that was to shake the world." *(John Austin, Muhammad the Prophet of Allah in T.P.'s and Cassel's Weekly for 24th September 1927).*

'মদীনায় আগমনের এক বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে তিনি সত্যিকারঅর্থেই মদীনার এমন একজন আধ্যাত্মিক, জাগতিক এবং পরাক্রমশালী শাসক হয়ে উঠেছিলেন যার হাতের সুইচ সমগ্র বিশ্ব কাঁপিয়ে দিতে পারত'।

৬- বৃটিশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং ডাক্তার **জন উইলিয়াম ড্রেপার** (১৮১১-১৮৮২) বলেন, "Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was born at Mecca, in Arabia the man who, of all men exercised the greatest influence upon the human race...Mohammed" *(John William Draper, M.D., L.L.D., A History of the Intellectual Development of Europe, London 1875, Vol.1, pp.329-330).*

'জাস্টনিয়ান-এর মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কায় এমন একজন মানুষের জন্ম হয়েছিল, যিনি গোটা মানবজাতির উপর সর্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)'।

৭- সাবেক ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য **দেওয়ান চাঁদ শর্মা** লিখেছেন, "Muhammad was the soul of kindness, and his influence was felt and never forgotten by those around him." *Diwan Chand Sharma, The Prophets of the East, Calcutta 1935, p. l 22.*

'মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন দয়ার্দ্র হৃদয়। তাঁর প্রভাব তাঁর সহচররা সবসময় অনুভব করতো; কখনোই তা বিস্মৃত হতো না'।

৮- আমেরিকান মনোবিদ এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর **ড. জুলিয়াস ম্যাসারমান** (১৯০৫-১৯৯৪) লিখেছেন, "People like Pasteur and Salk are leaders in the first sense. People like Gandhi and Confucius, on one hand, and Alexander, Caesar and Hitler on the other, are leaders in the second and perhaps the third sense. Jesus and Buddha belong in the third category alone. Perhaps the greatest leader of all times was Mohammed, who combined all three functions. To a lesser degree, Moses did the same." *(Jules Masserman, 'Who Were Histories Great Leaders?', TIME Magazine, July 15, 1974)*

'লুই পাস্তর এবং জোনাস সাল্‌কের মত মানুষরা ছিলেন প্রথম ধারার (জনহিতকর) নেতা। আর একদিকে গান্ধী ও কনফুসিয়াস, অপরদিকে আলেকজান্ডার, সিজার এবং হিটলারের মত নেতারা ছিলেন ২য় বা ৩য়

ধারার (রাজকীয় ও ধর্মীয়) নেতা। যিশুখৃষ্ট এবং বুদ্ধকে কেবল ৩য় ধারার (ধর্মীয়) মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে সম্ভবত: সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট নেতা হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) যিনি এই তিনটি ধারারই সুসমন্বয় করেছিলেন। কিছুটা স্বল্প পরিমাণে হলেও মূসা (আঃ) ঠিক একই কাজ করেছিলেন'।

৯- প্রখ্যাত বৃটিশ নারী অধিকার কর্মী, সমাজতত্ত্ববিদ ও লেখিকা **এ্যানি বেসান্ত** (১৮৪৭-১৯৩৩) বলেন, But do you mean to tell me that the man who in the full flush of youthful vigour, a young man of four and twenty [24], married a woman much his senior, and remained faithful to her for six and twenty years, at fifty years of age when the passions are dying married for lust and sexual passion? Not thus are men's lives to be judged. And you look at the women whom he married, you will find that by every one of them an alliance was made for his people, or something was gained for his followers, or the woman was in sore need of protection. *(Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammad (1932), p. 4)*

'কিন্তু তুমি কি আমাকে বুঝাতে চাইছ ভরা যৌবনের উচ্ছাসে পরিপূর্ণ সেই টগবগে যুবক সম্পর্কে, যে যুবক ২৪ বছর বয়সে তার চেয়ে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন এবং ২৬ বছর যাবৎ তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, তিনি ৫০ বছর বয়সের পড়তি যৌবনে এসে বিয়ে করেছিলেন কেবল যৌনাকাংখা ও যৌন তাড়না মেটাতে? না, মানুষের জীবনকে এভাবে বিচার করতে হয় না। অধিকন্তু, যদি তুমি ঐসব মহিলাদের দিকে লক্ষ্য কর যাদেরকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের সাথেই হয় মৈত্রীচুক্তির ব্যাপার ছিল, অথবা তাঁর ছাহাবীদের জন্য কিছু প্রাপ্তিযোগের বিষয় ছিল কিংবা মহিলাটির জন্য আশ্রয় ও নিরাপত্তার খুব প্রয়োজন ছিল'।

১০- আমেরিকান কূটনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ ও লেখক **ওয়াশিংটন আরভিং** (১৭৮৩-১৮৫৯) লিখেছেন, His military triumphs awakened no pride nor vain glory as they would have done had they been effected by selfish purposes. In the time of his greatest power he maintained the same simplicity of manner and appearance as in the days of his adversity. So far from affecting regal state, he was displeased if, on entering a room, any unusual testimonial of respect was shown to him. If he aimed at a universal dominion, it was the dominion of faith; as to the temporal rule which grew up in his hands, as he used it without ostentation, so he took no step to perpetuate it in his family." *(Washington Irving, 'Mahomet and His Successors', New York, 1920).*

'তাঁর সামরিক বিজয়গুলো কোন অহংকার বা অসার গৌরব মহিমা জাগিয়ে দিত না। কেননা সেগুলো নিজস্ব লক্ষ্যে পরিচালিত হত। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সময়ও তিনি তাঁর দুঃখ-দুর্দশার দিনের মত সাধারণ জীবন-যাপন করে এসেছেন। রাজকীয়তার প্রভাব থেকে ছিলেন এতই দূরে যে, তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশকালে কেউ নীতিবিরোধীভাবে সম্মানসূচক কিছু প্রকাশ করলে তা অপছন্দ করতেন। যদি তিনি বিশ্বজনীন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকেন, তবে সেটা ছিল বিশ্বাসের আধিপত্য। যেমনটি তার হাতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রটি এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর ঈর্ষাজাগানিয়া কোন জাকজমককে প্রশ্রয় না দেয়া থেকে অনুভব করা যায়। একই কারণে এই আধিপত্যকে স্বীয় পরিবারের জন্য চিরস্থায়ী করার কোন পদক্ষেপ নেননি তিনি'।

১১- আমেরিকার প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ **জেমস আলবার্ট মিচেনার** (১৯০৭-১৯৯৭) লিখেছেন, "Like almost every major prophet before him, Muhammad fought shy of serving as the transmitter of God's word sensing his own inadequacy. But the Angel commanded 'Read'. So far as we know, Muhammad was unable to read or write, but he began to dictate those inspired words which would soon revolutionize a large segment of the earth: "There is one God".

"In all things Muhammad was profoundly practical. When his beloved son Ibrahim died, an eclipse occurred and rumors of God 's personal condolence quickly arose. Whereupon Muhammad is said to have announced, 'An eclipse is a phenomenon of nature. It is foolish to attribute such things to the death or birth of a human being'." "At Muhammad's own death an attempt was made to deify him, but the man who was to become his administrative successor killed the hysteria with one of the noblest speeches in religious history: 'If there are any among you who worshiped Muhammad, he is dead. But if it is God you Worshiped, He lives for ever'." *(James Michener, 'Islam: The Misunderstood Religion,' Reader's Digest, May 1955, pp. 68-70)*

'পূর্ববর্তী সকল গুরুত্বপূর্ণ নবীর মত তিনি নিজেকে অযোগ্য ভেবে আল্লাহর রাসূল হিসাবে দায়িত্ব পালন করা থেকে দূরে দূরে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ফেরেশতা নির্দেশ দিলেন, "পড়ুন"। আমরা যতদূর জানি, তিনি পড়তে বা লিখতে অক্ষম ছিলেন; অথচ তিনি ঐ সকল ঐহিক বাণী শব্দ করে পড়তে লাগলেন যা শীঘ্রই পৃথিবীর এক বিরাট অংশের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করল এই মর্মে যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নেই"। সকল ব্যাপারেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন খুব ব্যবহারিক ও বাস্তববাদী। যখন তাঁর প্রিয় ছেলে ইবরাহীম মারা গেল এবং একই সময়ে তূর্যগ্রহণ লাগল। তখন শীঘ্রই মানুষের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, প্রভু শোক প্রকাশ করছেন। সেসময় কথিত আছে মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, "সূর্যগ্রহণ হল একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। এ ধরনের বিষয়কে কোন মানুষের জন্ম বা মৃত্যুর প্রতি আরোপিত করা নিছক বোকামী ছাড়া কিছুই নয়"। স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুকালে তাঁকে দেবত্বজ্ঞান করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু তার নির্বাহী উত্তরসূরী হওয়ার কথা ছিল যেই মহামানবের, তিনি ধর্মীয় ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ট এক বক্তব্যের মাধ্যমে এই আবেগের উন্মাদনাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বলে দিলেন যে, "তোমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পূজা করেছ, (তাহলে শোন) তিনি এখন মৃত। আর তোমরা যদি কেবল প্রভুরই ইবাদত করে থাক, তাহলে জেনে রেখ তিনি চিরঞ্জীব"।

[লেখক : কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

পাহাড়ের বুকে অন্য বাংলাদেশ

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(গত সংখ্যার পর)

জাদিপাই ক্লাসিক

২৫ সেপ্টেম্বর'১২ মঙ্গলবার। ঘুম থেকে উঠে দেখি সমস্ত শরীর ব্যথায় টনটন করছে। জোঁকে কামড়ানো স্থানটি থেকে সমানে রক্ত ঝরছে তখনও। ক্ষতের উপর নতুন টিস্যু পেপার বেঁধে দিলাম। মনে ভয় ঢুকে গেলেও কাউকে কিছু বললাম না। নইলে জাদিপাই ঝর্ণা দেখার পরিকল্পনা মাঠে মারা যেতে পারে। ফজরের ছালাত শেষে আবার কেওকারাডং শিখরে উঠলাম সূর্যোদয় দেখতে। শান্ত স্নিগ্ধ ভোর। রাতের আঁধার ফুঁড়ে ভোরের আলো কেবল ফুটতে শুরু করেছে। খণ্ড খণ্ড মেঘে ঢাকা আকাশ। সূর্য উঠার আগ মুহূর্তে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে আশ্রয় নেয়া ভাসমান মেঘমালা যেন আক্ষরিক অর্থেই দুগ্ধ ফেনিল সাগর হয়ে দেখা দিল। মনে হচ্ছে এন্টার্কটিকার কোন এক দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছি। কেবল পেঙ্গুইনের অপেক্ষা। এরই মাঝে রক্তিম আবেশে সূর্যিমামার শুভাগমন। কাচা রোদের মিষ্টি আলোয় পাহাড়ী ভুবনটা ভরে উঠল আর মেঘদলের শুভ্র বসনে প্রতিফলিত হতে লাগল বর্ণিল আলোকচ্ছটার এক অপূর্ব নাচন। কি যে এক মন্ত্রমুগ্ধকর ভোর! নীচ থেকে গাইডের ডাকে সম্বিত ফিরল। সকাল সকালই বের হতে হবে জাদিপাই ঝর্ণার উদ্দেশ্যে।

সাথে আনা বিস্কুট, পানি খেয়ে নাস্তা সারলাম। সাড়ে ৬টার দিকে যাত্রা শুরু হল। উত্তরমুখী রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। ২ ঘণ্টার পথ। গাইড বলল, 'সামনের পথ কিন্তু শুধুই নামার, সাবধানে আসেন'। আরে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নকে জয় করে শেষ করলাম এখন নীচে নামার সহজতম কাজে সাবধান হতে হবে? কি যে বলে লোকটা–মনে মনে হাসলাম। পথের দু'ধারে কুয়াশার মত মেঘে ঘেরা সারি সারি পাহাড়। ক্যাসকেডের মত ধাপে ধাপে নেমে গেছে কোন কোন স্থানে। এরই মাঝে খানিকক্ষণ হাটার পর শুরু হল বিরতিহীনভাবে নেমে যাওয়া ঢালু রাস্তা। বেশ রিলাক্সেই হাটছি। মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে নামছি দৌড়ের গতিতে। আধাঘণ্টার মধ্যে পৌঁছলাম পাসিংপাড়া বা সাইকতপাড়া। আগেই জেনেছিলাম দেশের সর্বোচ্চ গ্রাম এই পাসিংপাড়া। সেখানে লোকালয় ছুঁয়ে ফিরফিরে মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে নির্বিঘ্নে। দারুণ দৃশ্যপট। আড়ামোড়া ভাঙ্গা পাহাড়ী সকালে সদ্য তেতে ওঠা কাঁচা রোদের দুরন্ত খেলা বেশ জমে উঠেছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের সকাল হয়নি তখনও। কেবল দু'একটি ঘরের জানালা দিয়ে ব্যোম শিশুদের উকিঝুঁকি নজরে পড়ছে। গ্রামের পথে শূকরের মলের ছড়াছড়ি বেশ বিরক্তিকর ঠেকল।

পাসিংপাড়া ছেড়ে আর কিছু দূর গেলেই কোরিয়ান অর্থায়নে পরিচালিত কানান রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলটির অবস্থান। পাহাড়ের উপর খেলার মাঠ আর তার এক প্রান্তে 'এল' শেপের এই স্কুলটি। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস হয়। স্কুল থেকে কিছুটা নীচের এক পাহাড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা। প্রায় ৬০-৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী এখানে লেখাপড়া করে। সকলেই পাহাড়ী উপজাতি এবং অধিকাংশই আবাসিক। বাংলা মাধ্যমেই পড়ানো হয়। পড়াশোনার মানও যথেষ্ট উন্নত। ইউনিফর্ম দেখেই বোঝা যাচ্ছে এদের পিছনে ভাল রকম অর্থ ব্যয় করা হয়। চারিদিকে পাহাড় পরিবেষ্টিত স্নিগ্ধ প্রকৃতির কোলে শুনশান স্কুলটি দেখে মনে হল দার্জিলিং-এর সেই বিখ্যাত স্কুলটির কথা। যেখানে বহু অর্থ খরচ করে এ দেশের অর্থশালীরা তাদের সন্তানদের পড়াশোনা করাচ্ছেন। বাংলাদেশ সরকারও ইচ্ছা করলে এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহার করে অনুরূপ উন্নতমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারত। ওখানকার শিক্ষকদের সাথে কথা হল। অধিকাংশেরই বয়স ২৫-এর নীচে এবং বাঙ্গালী। জেনে অবাক হলাম এই কোরিয়ান স্কুলের প্রধান শাখাটি দিনাজপুরে অবস্থিত। ছাত্র-ছাত্রীরা এখান থেকে পাশ করে সুদূর দিনাজপুরে যায় বাকী পড়াশোনা সম্পন্ন করার জন্য।

স্কুলটি পরিদর্শনের পর আবার ঢালু পথ বেয়ে নামতে শুরু করলাম। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলগুলো প্রায় জনমানবশূন্য মনে হলেও চলতি পথে বহু পাহাড়ে চাষাবাদ হতে দেখছি। বিশেষ করে শৈল্পিক আর্টে বোনা আদা, হলুদ ও আনারসের গাছ পাহাড়ের ঢালগুলো চমৎকারভাবে শোভামণ্ডিত করে রেখেছে। কেওকারাডং-এর চূড়াতেই তো দেখে আসলাম শীষে ভরা ধানের চারা। আজ এই দুর্গম এলাকাতেও দেখছি দূরের পাহাড়ের শীর্ষভাগে আদা ও হলুদ চারার সমাবেশ।

এদিকে নামার পথ যে আর ফুরোয় না। খাড়াভাবে নামছি তো নামছিই। এক পর্যায়ে এত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে মাহফুয বিশ্লেষণ করতে বসল পর্বতারোহণ নাকি অবরোহন–কোনটা বেশী কঠিন? ঘণ্টা পার হয়ে গেল তবুও যখন নামার পথ শেষ হল না মাহফূযের তখন রীতিমত কেঁদে ফেলার দশা। আর্তনাদের সুরে বলে উঠল, 'এখন তো নামছি কোন রকমে, ফেরার পথে উঠব কীভাবে?' লাঠিতে ভর দিয়ে পা টিপে টিপে হাটছি। তীব্র ব্যথায় পা জমে আসছে। হাটার চেয়ে তাই এখন মনে হচ্ছে দৌড়ানোই সহজ। একবার দৌড়ে, একবার হেটে এই কষ্টকর যাত্রার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। সামনেই দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী ঢালের সবুজ পটভূমিতে ছবির মত সাজানো গ্রাম জাদিপাই পাড়া। সেখানে নেমে আসার পর কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে আবার যাত্রা। গোটা রাস্তায় পর্যটক বলতে কেবল আমরাই। আর কেউ নেই। ঝিঁঝিঁ ছাড়াও নাম না জানা কোন এক পোকার বাঁশীর মত তীক্ষ্ণ চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে আসছে। চলতি পাথে মাঝে মাঝে দেখা মিলছে দু'এক জন পাহাড়ী জুম চাষীর। সবার সাথেই শুভেচ্ছা বিনিময় করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ী পথ ছেড়ে নেমে আসলাম এক সমতলভূমিতে। চারিদিকে শিহরণ জাগানো জমাট মৌনতায় ঢাকা সুউচ্চ পাহাড়। আর মাঝখানে ধানের ক্ষেত আর নিঃশব্দে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার পানির ঝিরি। ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছি। আগের দিন বৃষ্টি হয়েছে বলে জোঁকের উৎপাত খুব। গতকাল আমাকে জোঁকে ধরায় এমনিতেই সবাই জোকাতঙ্কে ভুগছে, তার উপর সমতলে নামতেই আমি একসাথে ৩টি জোঁকের কামড় খেলাম। চারিদিকের অসাধারণ নৈসর্গিক শোভা উপভোগ বাদ দিয়ে সবার দৃষ্টি এবার কেবল জোঁকের দিকে। কর্দমাক্ত পথে হাটতে ২ মিনিট পর পর জোঁক ছাড়ানোর জন্য দাঁড়িয়ে যেত হচ্ছে। মনে হল জোঁকের কারখানায় এসে পড়েছি। এমনই জড়সড় অবস্থা আমাদের যে বাঘ-ভাল্লুকের ভয়েও বুঝি কেউ এত অস্থির হয় না। আরো কিছুক্ষণ চলার পর এক পাহাড়ের উপর উঠে আসলাম।

নিঃসঙ্গ ঝর্ণার সশব্দ আবির্ভাব

সমতলে নামার পর অনেকক্ষণ ধরেই ঝরণার শো শো পতন শব্দ কানে ভেসে আসছিল। এবার পাহাড়ে উঠে সে শব্দ ঝংকার অনেক জোরে শুনতে পাচ্ছি। গাইড বলল, ঝরণা পর্যন্ত পৌঁছতে পাহাড় থেকে এই বিপজ্জনক পথটি নেমে অতিক্রম করতে হবে। প্রায় খাড়াভাবে ৪৫ ডিগ্রি এঙ্গেলে পিচ্ছিল কর্দমাক্ত জঙ্গলময় ঢালু পথ। সঙ্গে জোঁকের আতঙ্ক। গাইডকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে অধঃমুখী যাত্রা শুরু হল। খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। পিছন থেকে কেউ স্লিপ করে পড়লেই সবাই মিলে একসাথে জীবন হারাতে হবে। নীচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না ঘন জঙ্গলের কারণে। কেবল ঝর্ণার শো শো প্রবল শব্দ। জোঁকের ভয়ে সযত্নে গাছের ডালপালা এড়িয়ে চলছি। তবুও রেহাই পেলাম না। আমার ঘাড়ে আর কনুইয়ের উপর বড় দুই

জোঁক উঠে রক্ত খাওয়া শুরু করেছে। নিজেকে পতনের হাত থেকে বাঁচাব, না জোঁক ছাড়াব। মাহফুয এসে গামছা দিয়ে জোঁকগুলো ছাড়িয়ে দিল। আরো কিছুদূর নামার পর এক বিপজ্জনক বাঁকের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল মাহফুয। ভাগ্যক্রমে এক গাছের ডালে পা আটকাতে পেরে এ যাত্রায় বেঁচে গেল বটে, কিন্তু বেশ ভাল রকম আঘাত পেল। আরো অনেকদূর নামার পর হঠাৎ গাছপালার ফাঁক দিয়ে আবির্ভূত হল সেই কাংখিত জাদিপাই ঝর্ণা। পাশের পাহাড় ভেদ করে যেন আকাশ ফুঁড়ে ধেয়ে আসছে এক প্রবল স্রোতধারা। উপরাংশে একধাপ নেমে ঝরণাটি প্রায় ৫০ ফুট প্রশস্ত হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে অন্ততঃ ৬০/৭০ ফুট নিচে সবেগে আছড়ে পড়ছে। আরো কিছুটা নেমে আসার পর ঝর্ণার পূর্ণ ভিউটা নজরে এল। সুবহানাল্লাহ! কি যে এক বিস্তীর্ণ ভুবনজয়ী হাসি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানাল আল্লাহ্র এই অসাধারণ সৃষ্টি! আমাদের তো আত্মহারা অবস্থা। চারিপাশ নজরে আসার পর মনে হল বহু বছর পূর্বে এখানে কোন এক দানবীয় ভূমিধ্বস হয়েছিল এবং তাতে পাহাড়ের একটা বিরাট অংশ বিধ্বস্ত হয়ে এই ঝর্ণার সৃষ্টি। ধ্বসে যাওয়া মাটির ঢিবি বিস্রস্তভাবে নিচে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিশাল বিশাল পাথরে রূপ নিয়েছে। যার ফাঁক গলিয়ে স্বর্পিল গতিতে অব্যাহত স্রোতধারা হারিয়ে যাচ্ছে অজানার পানে। পাহাড়ের গায়ে ভূমিধ্বসের গভীর চিহ্নগুলো বেশ ভয়ংকর দেখাচ্ছে। যেন ডকুমেন্টারীতে দেখা সহস্র বছরের অনাবিস্কৃত কোন প্রাগৈতিহাসিক এলাকা। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়েই বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে ঝর্ণাটি ক্যামেরাবন্দী করে ফেললাম। দুর্গম হওয়ার কারণে এর নাগাল পেয়েছে দেশের খুব অল্পসংখ্যক মানুষই। ফলে ঝর্ণার আদিম অকৃত্রিমতা অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। আজও এখানে আমরা ছাড়া আর দ্বিতীয়টি কেউ নেই। এডভেঞ্চার মুডে কাঁপা কাঁপা হৃদয়ে নীচে নেমে এলাম। এক দৃষ্টে দেখছি ঝর্ণার অবিরাম পতন দৃশ্য। বর্ষা মৌসুম শেষ হলেও ঝর্ণাটি এখনও পূর্ণ যৌবনা। আহা, জীবনটা যেন আজ স্বার্থক হয়ে গেল। এক নিমিষেই বুকটা বিশাল চওড়া করে দিল প্রকৃতির এই অকৃত্রিম বুনো উদ্যমতা। প্রতিধ্বনিত শব্দের প্রচণ্ডতায় কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছি না। বাতাসে ঝর্ণার ঝাপটা এসে চোখে-মুখে লাগছে! সে ঝাপটা রোধ করে ঝর্ণার দিকে সরাসরি স্থির চোখে তাকানো দুরূহ। সূর্যের আলো ঝর্ণার গায়ে পড়া মাত্রই নানা মাত্রায় বর্ণিল রংধনু হেসে উঠছে। মেঘমুক্ত দিনে এখানে সারাদিনই রংধনুর খেলা দেখা যায়। ঝর্ণার পতনস্থলে তৈরী হয়েছে এক পুকুর। সাতার জানি না। তাই পার্শ্বের বড় বড় কয়েকটি পাথর ডিঙিয়ে ঝর্ণার একেবারে নিকটে চলে এলাম। গাইড ভয় দেখিয়ে বলল, 'ঝর্ণার নীচে যাবেন না, উপর থেকে নুড়িপাথর পড়তে পারে'। কে শোনে কার কথা। আক্ষরিক অর্থেই পর্বতসম বাধা জয় করে যখন এতপথ আসতে পেরেছি, শেষ বেলায় এতটুকু বাধা কেন অজেয় হয়ে উঠবে? নাই বা জানি সাতার, তাই বলে কি এই অপরূপ সৌন্দর্যকে নিজের মত করে উপভোগ করার স্বাদ অপূর্ণ রাখব? ঝর্ণার গা ঘেঁসে এক পা দু'পা করে নিজেকে সপে দিলাম অনেক উপর থেকে ধেয়ে আসা প্রবল জলধারার নীচে। পিঠের উপর যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। তবুও কুছ পরোয়া নেহি। ভয়কে জয় করে বীর বেশে আরো সামনে এগুচ্ছি। বাকিরাও সাহস পেয়ে গেল। একে একে সবাই চলে এল ঝর্ণার নিচে। রঙধনু মেখে ঝুকিপূর্ণ পাথরের গা বেয়ে আমরা ঝর্ণাধারার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চলে এলাম। মাথার উপর অবিরাম ঝাঁপিয়ে পড়া জলধারায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে, তবুও তাতে সিক্ত হচ্ছি বাধ না মানা অবোধ শিশুর মত। ঘণ্টাখানিক অনিন্দ্য সুন্দর এই ঝর্ণার কলকাকলীর সাথে কাটল এক অসাধারণ মুহূর্ত। শেষের বেলায় ঝর্ণার স্রোতধারা যেদিক দিয়ে নিচে নেমে গেছে সেদিকে এগিয়ে কিছু দূর যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সাহসে কুলালো না। এই নির্জনালোকের সর্বত্রই এক অদ্ভুত গা ছমছমে আবহ। একান্ত সাহসীও এখানে বীরত্ব দেখাতে দু'বার ভাববে।

দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ওষ্ঠাগত জীবন

বেলা সাড়ে ৯টার দিকে জাদিপাই ঝর্ণাকে গহীন বনে একলা নিঃসঙ্গ রেখে আমাদের ফিরতি যাত্রা শুরু হল। আসার সময় সারা পথ নামতে নামতে মনটা বিষিয়ে ছিল। এবার উঠতি যাত্রায় তাই বেশ স্বস্তি বোধ করছি। তেমন বিপদ ছাড়াই উঠে এলাম পাহাড়ের মাথায়। সেখান থেকে নীচে নেমে আসতেই আবার সেই জোঁকের রাজ্যে। সমতল ভূমি না আসা পর্যন্ত জোঁকের ভয়ে একটানা দৌড়ে এই পথটুক অতিক্রম করলাম। কিছুক্ষণ পরই শুরু হল পাহাড়ে উঠার পালা। আসার সময় যে পথ বেয়ে বরাবর নেমে এসেছিলাম এবার সে পথে বরাবর উঠার পালা। গোটা সফরে এই অংশটিই ছিল আমাদের সবচেয়ে কষ্টকর পর্ব। সকালের সামান্য নাস্তাটুকু বহু আগেই হজম হয়ে গেছে। অতিরিক্ত কোন খাবার সাথে নিয়ে আসিনি। এ অবস্থায় উঠছি তো উঠছিই। শক্তি ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে। আধাঘণ্টা হাঁটতেই সবার অবস্থা একেবারে কাহিল। কারো দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। বাংলা পাঁচের মত হয়ে উঠা করুণ চেহারাগুলোতে যেন গুমরে ফিরছে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' হাহাকার রব। সেই সাথে সারা রাস্তায় শূকরের মলের উৎকট দূর্গন্ধে প্রাণটা ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। কোনক্রমে জাদিপাই পাড়া পর্যন্ত পৌঁছতেই এক বাড়ীর উঠোনে মাটির বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মনে হল সামনে আর না এগিয়ে আজকের দিনটা এখানেই থেকে যাই। এদিকে গতকালের ক্ষত থেকে রক্ত তখনও অনবরত ঝরছে। বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। ব্যান্ডেজ আর পাজামা লালে লাল। গাইডের একটাই কথা, ধৈর্য ধরেন, জোঁকের কামড়ে এমনই হয়, এক সময় এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। যে বাড়ীর উঠোনে বসে চা পান করছিলাম, তাদেরকে বললাম আপনারা কি করেন জোঁকে কামড়ালে? ওরা প্রথমে তামাক পাতার পানি দিয়ে ধুতে বলল। তাই করলাম। কোন কাজ হল না। পরে ভিতর থেকে ছাই নিয়ে এসে এক মহিলা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল। আল্লাহ্র কি রহমত, ২ মিনিটেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। সবকিছুকে হারিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত এই তুচ্ছ ছাই যে মহৌষধ হয়ে উঠবে তা কে জানত! মনে মনে আল্লাহ্র অশেষ শুকরিয়া আদায় করে ওদেরকে ধন্যবাদ জানালাম। এই উপকারটা না করলে আগামীকাল রুমা বাজার পৌছে ডাক্তার না দেখানো পর্যন্ত হয়তবা রক্ত ঝরতেই থাকত। জোঁকের জন্য সবাই উপদেশ দেয় লবণ রাখার জন্য। এই অভিজ্ঞতার পর আমার তো মনে হল লবণের চেয়ে ছাই রাখাই অধিক যরূরী। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাড়ির বাচ্চাদের হাতে চকলেট ধরিয়ে দিলাম। ওরা এতই খুশী হল যে, মনে হল পরবর্তীতে আর কখনো এদিকে এলে চকলেটের আলাদা ব্যাগ নিয়ে আসতে হবে। দুর্গম পাহাড়ে এসব ছোট্ট উপহারও এদের কাছে মহার্ঘ্যই। ব্যোম পরিবারটিকে বিদায় জানিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম।

উফ্..কি বিভীষিকাময় এ যাত্রা। হাটার কোনই বিকল্প নেই। ক্লান্তিতে রাস্তার উপরই কয়েকবার শুয়ে পড়তে বাধ্য হলাম আমরা। মাহফুয বলল, 'জীবনের কোন কোন সময় মৃত্যুকেই অধিক শ্রেয় মনে হয়, আজ আমার সেই অবস্থা'। পা লোহার মত ওজনদার হয়ে উঠেছে। চোখে দেখছি সর্ষে ফুল। এ অবস্থাতেই কোন রকমে হাচড়ে পাচড়ে যখন কোরিয়ান স্কুলে পৌঁছলাম তখন বেলা সাড়ে এগারোটা পার হয়ে গেছে। দোকানের সামনে বেঞ্চের উপর সটান শুয়ে পড়লাম অচেতনের মত। 'এই তো আর সামান্য পথ'–গাইডের অভয়বাণী বড়ই পরিহাস্য শোনালো। ইস্, বাকি পথটা যদি কেউ স্ট্রেচারে নিয়ে যেত! বিরতির পর টলতে টলতে আবার যাত্রা শুরু। পাসিংপাড়ায় সামান্য বিরতি। আবার যাত্রা। ঠিক দুপুর সাড়ে বারোটায় কেওকারাডং শীর্ষে এসে পৌঁছলাম ফ্যাকাশে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে। আমাদের করুণ দশা দেখে লালাবাবু যারপরনেই বেদনাহত বোধ করলেন।

মিশন কেওকারাডং টু বগালেক

চূঁড়ায় উঠার পর পায়ের ব্যথা আর ক্ষুধায় মরণাপন্ন অবস্থা। হাত-পা ধুয়ে ডাইনিং-এ বসেই হাঙরের পেট নিয়ে গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করলাম। মেন্যু খুব সাধারণ। বেগুনের তরকারী আর ডাল। আগের দু'বেলায় তেমন বেশী খায়নি। তাই ভাব বুঝে বাড়িওয়ালী ভাত অল্পই রান্না করেছে। কিন্তু ক্ষুধার প্রচণ্ডতায় কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ভাত সাবাড় হয়ে গেল। তখনও মাহফুয খেতে বসেনি। বাড়িওয়ালীর তো মাথায় হাত। অনভ্যস্ত বাংলায় রসিকতা করে বলল, 'এত খেলে ২০০ টাকা করে নেব'। নাজীব যখন বলল আজ আপনার বাড়িতে যা কিছু আছে সব খেয়ে ফেলব, তখন তার সে কি হাসি! আমাদের টেবিলে রেখে মহিলা পাহাড়ে ফলানো বিন্নী ভাত চড়াতে গেল। আমরা এঁটো হাতে অধীর অপেক্ষায় বসে রইলাম। অবশেষে ভাত আসলে শুধু ডাল দিয়েই হাভাতের মত খেলাম। জীবনে এত খাওয়া আর খেয়েছি কি না মনে পড়ে না।

খাওয়ার পর গাইড বলল, দেড়টার মধ্যে বগালেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে, নয়ত রাত হয়ে যাবে। কিন্তু কটেজে ঢুকে আমি অচেতনের মত ধপ করে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্ত শরীর আর এক ইঞ্চিও নড়তে চাইছে না। 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দেব কোথা'–প্রবাদটি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। প্রায় ৪০ মিনিট পর উঠে দু'টো পেইনকিলার আর কাফী ভাইয়ের বানানো শরবত-গ্লুকোজ খেয়ে একটু চাঙ্গা হওয়ার চেষ্টা করলাম। বাইরে তাকিয়ে দেখি ঘন কালো মেঘ। প্রবল ঝড়বৃষ্টি নামার পূর্বমুহূর্ত। মেঘ ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দর্শনে। ব্যালকনিতে যেতেই অনুভব করলাম মেঘেরা আমাদের গা ছুয়ে অতিক্রম করছে। ঝুম বৃষ্টি নামল পাহাড়ে। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। প্রায় আধাঘণ্টা একটানা বৃষ্টি হল (সম্ভবতঃ পাহাড়ের এত উপরে ঝড় হয় না, কেননা পরদিন রুমা বাজারে শুনি গতকালের প্রবল ঝড়ে সেই যে বিদ্যুৎ চলে গেছে আর আসেনি, অথচ কেওকারাডং-এ সামান্য বাতাস ছাড়া ঝড়ের লেশমাত্র ছিল না)। বৃষ্টির প্রকোপ কমলে বেলা ২টার দিকে আমরা কটেজ ছেড়ে বের হলাম। লালা বাবুকে ৫ জনের থাকা-খাওয়ার বিল বাবদ ২৭০০ টাকা মিটিয়ে দেয়া হল। বাবুর ছোট্ট একবছরের নাতিটার সাথে আমাদের খুব খাতির জমে গিয়েছিল। কিন্তু ঘুমিয়ে থাকায় ওর হাতে কিছু দেয়া হল না। লালা বাবু ও তার স্ত্রী আমাদেরকে আন্তরিকভাবে বিদায় জানালেন। উপহার হিসাবে পেলাম পাহাড়ে চাষ করা এক ব্যাগ আদা।

টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে আমাদের ট্রেকিং শুরু হল। অভিযাত্রী মুড অবশ্য অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপে টনটন করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে দুই হাটু। তবে ভেজা আবহাওয়ায় আগের মত কষ্টটা আর নেই। রাস্তাও বেশ সমতল। মাঝে মাঝেই অদৃশ্য ঝর্ণার দূরাগত গর্জন ভেসে আসছে। বৃষ্টির কারণে জেগে উঠেছে এসব ঝর্ণা। ভেজা কর্দমাক্ত রাস্তায় বার বার স্লীপ করছি। জোঁকের উৎপাতও বেড়েছে খুব। মাঝে মাঝেই স্যান্ডেল খুলে জোঁক ছাড়াতে হচ্ছে। তবে আগের মত আতংকে নেই। ছাইয়ের টোটকা পেয়ে আমাদের মনোবল এখন অনেক শক্ত। টানা হেঁটে মাঝে মাত্র ১ বার বিরতি নিয়ে বিকাল সাড়ে চারটার দিকে আমরা চিনরি ঝর্ণার কাছে পৌঁছলাম। বৃষ্টির কারণে ফুলে ফেপে উঠেছে ঝর্ণাধারা। ভিতরে ঢুকে ঝর্ণার আসল চেহারাটা দেখে তো আমরা একেবারে মুগ্ধ। দুই-তিন দিকে পাহাড়ী নালা দিয়ে পানি পতিত হয়ে দুটি ধাপে নিচে নেমে এসেছে। সেই সাথে শব্দের তুমুল ঝংকার। অসাধারণ এই ঝর্ণাটিতে বেশ কিছু সময় কাটালাম। সেখান থেকে বের হয়ে মাগরিবের কিছু পূর্বে সাড়ে ৫টার দিকে বগালেক পৌঁছে গেলাম। মাহফুয ততক্ষণে সিয়াম দিদির কটেজ ঠিক করে ফেলেছে। সেখানে ব্যাকপ্যাক রেখেই গোসলের জন্য ছুটলাম। পানিতে নামার সময় গাইড বলল, জীবনে অনেক জায়গায় গোসল করেছি; তবে বগালেকের মত এত প্রশান্তি কোথায় পাই না। সিঁড়ি বাধানো পুকুরে দু'পা ফেলতেই গাইডের কথার সত্যতা পেলাম। ঝকঝকে পানিতে গা ডুবাতেই সমস্ত ক্লান্তি যেন ঝরে পড়ল। চমৎকার ওম ওম গরম পানিতে এ যেন প্রাকৃতিক হটশাওয়ার। কাফী ভাই সাঁতরে অনেক দূর গেল। আর তীরে দাঁড়িয়ে আমরা অসহায় দৃষ্টিতে তার জলকেলি দেখলাম। জীবনের প্রায় মধ্য গগণে এসে আজ বগা লেকের পাশে দাঁড়িয়ে সাতার না শিখতে পারার আক্ষেপ বড্ড বেশী যন্ত্রণা দিল। লেকের পাড়ে আঁধার নেমে এলে সিয়াম দিদির কাঠের দোতলা সরাইখানায় ফিরে আসলাম। মাগরিব-এশা পড়েই ঘুম। রাত সাড়ে আটটার দিকে খাওয়ার ডাক পড়ল। খুব সুস্বাদু ডিম ভূনা দিয়ে ভাত খেলাম। ডাইনিং-এ বসে দেখলাম পাড়ার নারী-পুরুষ ভিড় করে সৌরবিদ্যুত চালিত রঙ্গিন টেলিভিশনে মিজোরামের ভাষায় কোন সিনেমা দেখছে। সম্ভবত অত্র অঞ্চল জুড়ে এটাই একমাত্র টেলিভিশন। ভেবেছিলাম রাতের খাওয়ার পর বগালেকপাড়ে বসে চাঁদ দেখব, জমাট অন্ধকারে গহীন বনের পথে হেঁটে বেড়াব। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে সেই যে নেমেছে বেরসিক বৃষ্টি, থামার কোন লক্ষণ নেই। শেষমেষ ব্যথার ডিপোতে পরিণত হওয়া শরীরটাকে বিশ্রাম দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম। ১৮ জনের জন্য বরাদ্দ ঘরটা আমাদের ৫ জনের দখলে। ইচ্ছেমত জায়গা করে নিয়ে মহা ঘুম। এ সুখ দেখলে পর্যটন মৌসুমে ভীড়ের মধ্যে এখানে আসার কথা কোন বোধহয় পাগলেও চিন্তা করত না!

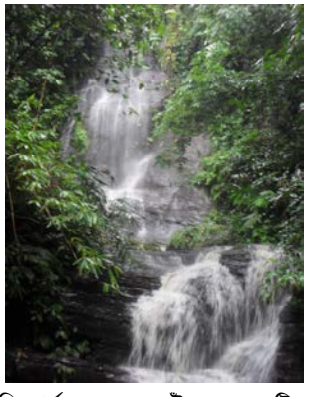

বগালেক টু চট্টগ্রাম

২৬ তারিখ ভোর। দীর্ঘ ঘুমের পর শরীরটা ঝরঝরে হবে কি তীব্র ব্যথায় পা মাটিতে ফেলতে পারছি না। কোনরকমে ছালাতটা আদায় করলাম। ছালাতের পর মাহফুয আবার গা এলিয়ে দিল। কিন্তু ভোরের বগালেক দেখার লোভ সামলাতে না পেরে শরীরের তীব্র ব্যথা নিয়েও আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আঁধার তখন প্রায় কেটে গেছে। স্বচ্ছ

বগালেক প্রতিবিম্বিত পাহাড়ের সবুজে সবুজাভ। লেকের ওপারে মারমা পাড়া দেখা যাচ্ছে। হাতে সময় আছে দেখে লেকের ধার ঘেঁষে পাহাড়ী পথ ধরে মারমা পাড়ার দিকে এগুলাম। ওপারে পৌঁছে দেখি মূল গ্রামটি অনেক নীচে। সেখানে একটি প্যাগোডাও দেখা যাচ্ছে। পিচ্ছিল পথ ধরে অনেকটা পথ হেটে গ্রামের ভিতর নেমে এলাম। সেখানে দু'তিন জন লোকের সাথে কথা হল। একজন মাছ ধরতে যাচ্ছিল বগালেকে। তার কাছে অনেক তথ্য পেলাম। জানা গেল বগালেকে কখনও মাছ ছাড়া হয় না, এমনিতেই হয়। যে যার খুশী মত মাছ ধরে, কেউ বাধা দেয় না।

প্রকৃতির নিবিড় যত্নে এভাবেই লালিত-পালিত হচ্ছে পাহাড়ীরা। জীবন-জীবিকা সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন রকম অপ্রাপ্তি বা হতাশা নেই। বনের পাখির মত মনের আনন্দে দিন আনে দিন খায়। জীবনের ভেলা বয়ে যায় তাদের নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে। এ ক'দিনে পাহাড়ী অধিবাসীদের সহজ সরল প্রাণবন্ত জীবন-যাপন দেখে মনে হল প্রকৃতির রাজ্যে এরাই বুঝি সবচেয়ে সুখী মানুষ। কোন অভাব নেই, অনুযোগ নেই। বাচ্চাগুলোকে কী আদর-স্নেহেই না তারা মানুষ করে তুলছে। এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে দু'চারটি শিশু দেখা যায় না। মা কিংবা বাবার কোলে-পিঠে পরম মমতায় দুধের শিশুগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে ঝুলে আছে। সেখানে বসে কী সুন্দর টুক টুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কোন কান্নাকাটি বা অস্বস্তির চিহ্ন নেই চেহারায়। ভোরের আলোতে দিনের শুরু আর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যা নামতেই ঘুমের আয়োজন। নেই ভাববিলাসের এতটুকু ফুরসৎ। এভাবেই অতিবাহিত হয় পাহাড়ী জীবনের প্রতিটি দিন। পাসিংপাড়ার এক দোকানে বসে এসবই ভাবছিলাম আর বহু দূরের এক পাহাড়ে অবস্থিত রুমনা পাড়ার দিকে ইঙ্গিত করে গল্প করছিলাম। এসময় আমাদের কথার ফাঁকে নিছক ফকীরী বেশে উঠানে বসে থাকা মহিলাটি ভাঙা বাংলায় স্বগতোক্তি করল– রুমনার ঝর্ণাটি খুব সুন্দর। কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো। বুঝতে পারলাম, সৌন্দর্যাভূতি জিনিসটা কতটা সহজাত, কতটা মানবীয়, কতটা সার্বজনীন। নইলে এই ভূস্বর্গের অপরূপ সৌন্দর্য কাননে যাদের নিত্য বসবাস, তাদের কাছে সুন্দরের আবেদন পৃথকভাবে ধরা পড়বে কেন!

এদের কষ্টসহিষ্ণুতার ইতিহাস তো প্রবাদবাক্যের মত। বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে দুর্গম পাহাড়ী পথে ঘন্টার পর ঘন্টা, মাইলের পর মাইল নির্বিবাদে হেটে যায়। এমনকি রুমা বাজার থেকে বগামুখপাড়া পর্যন্ত এই ১৩ কিঃমিঃ রাস্তা, যেখানে চাঁদের গাড়ি হরহামেশা মেলে, তাতে বিনা পয়সায় চড়ার আমন্ত্রণ জানালেও অনেকে উঠতে চায় না। মাথায় ভারী বোঝাবাহী তোরণ নিয়ে নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে কীভাবে মাইলের পর মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে চলে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পুথিজ্ঞানহীন এসব প্রকৃতির সন্তানদের মধ্যে এখন এনজিওদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার আলো ছড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু বিনিময়ে তাদেরকে দিতে হচ্ছে চড়া মূল্য। পূর্বে তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু অধিকাংশই এখন খৃষ্টান হয়ে গেছে। যাওয়া-আসার পথে যতগুলো গ্রাম পড়ে তার প্রায় সবগুলোতেই সুসজ্জিত চার্চের দেখা মেলে। কেবল বগালেকের মারমাপাড়াটি এখনো বৌদ্ধ রয়ে গেছে। এক দোকানী বলল, পাহাড়ীরা একসময় সবাই বৌদ্ধই ছিল। গত দু'এক পুরুষ থেকে তারা খৃষ্টান হয়ে গেছে। খৃষ্টান মিশনারীরা এসব এলাকায় খুব তৎপর। তাবলীগ জামাআত সারাবিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য সময় লাগাচ্ছে। কিন্তু দেশের মধ্যে এই এলাকাগুলো কেন তাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেল তা আল্লাহই মা'লূম। এই সুন্দর মনের মানুষগুলোকে কীভাবে এই মিশনারীদের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং কী উপায়ে ইসলামের সত্য দাওয়াত এদের কাছে পৌঁছানো যায়, এ বিষয়টিই বার বার মনে ধাক্কা দিয়েছে এদের সাথে সাক্ষাতকালে।

মারমাপাড়ার প্রবেশমুখেই একটা প্যাগোডা। সেখানে ঢোকার পর দেখলাম ১৪/১৫ বছরের নাদুস-নুদুস ন্যাড়া মাথা একজন হবু ভিক্ষু শুয়ে আছে। মুখে কথা নেই। কেবল ইশারা করছে। সম্ভবত কোন ব্রত পালনে রত। ওর ভাবভঙ্গিতে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। ছোট্ট একটি বুদ্ধ মূর্তির সামনে দেশী-বিদেশী টাকার নোট ঝুলছে। কৌতূহলবশত বিদেশী টাকাগুলো কোন দেশের তা বোঝার জন্য হাত দিয়ে দেখছিলাম। এসময় প্রধান ভিক্ষু ভিতরে প্রবেশ করে তাতে স্পর্শ করতে নিষেধ করল হাসিমুখেই। সাথে একটি বাটিতে বেশ কয়েকটি ভুট্টা নিয়ে এসেছেন। সেখান থেকে একটি বুদ্ধমূর্তির সামনে রেখে আমাদের তিনজনের হাতেও তিনটি দিলেন। আমরা না নিতে চাইলেও তার জোরাজুরিতে নিতে হল। ভিতরে টানানো অনেক ছবির মধ্যে রাখাইন স্টেটের একটি ক্যালেণ্ডার দেখতে পেলাম। ক্যালেণ্ডারটির ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা হাতে নিয়েছি। হাত নাড়িয়ে বাধ সাধল ঐ পিচ্চি হবু ভিক্ষুটাই।

ঘড়িতে ৭টা বেজে গেছে। প্যাগোডা থেকে বের হয়ে হাটতে হাটতে ব্যোমপাড়ায় ফিরে এলাম। ঘন্টাখানিক পূর্বেই সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে সূর্য তখন কেবলই উঁকি দেয়া শুরু করেছে বগালেকপাড়ায়। শরতের মেঘমুক্ত ঝকঝকে নীল আকাশ। আর তার শোভাবর্ধনে নিয়োজিত কাচা রোদের আলো ঝলমলে টুকরো মেঘের অসংখ্য ফুটফুটি। দুর্দান্ত এই আকাশটাই কি কবিগুরুর কল্পনার সেই নীলাম্বরী! সত্যিই সভ্যতার কোলাহলমুক্ত শান্ত-সুনিবিড় পাহাড়ী ভুবনে কেবল এই স্বচ্ছ সুনীল আকাশ দেখতেই বুঝি বার বার আসা যায়।

বগালেকেই গোসল করলাম। গোসলের পর আলুভর্তা, ডিমভাজি আর ডাল দিয়ে খুব তৃপ্তিভরে নাস্তা সারলাম। চা পান করার সময় সিয়াম দিদি এসে হাজির। দিদির বাবা এই পাড়ার সর্দার। তার স্বামী বাঙালী এবং একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। থাকেন নারায়ণগঞ্জে। শিক্ষিতা এই মহিলার আভিজাত্য ও অত্যন্ত অমায়িক আচরণ সত্যিই মুগ্ধ করার মত। আঁচ করতে পারলাম সিয়াম দিদির কেন এত নাম-ডাক কেওকারাডং ভ্রমণে আসা পর্যটকদের কাছে।

ফেরার বেলা

সিয়াম দিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেলা ৮টার দিকে আমরা এই পর্বের সর্বশেষ হন্টনযাত্রা শুরু করলাম। পাহাড়ের উপর উঠে আরেকবার দৃষ্টি ফিরালাম বগালেকের দিকে। রহস্যে ঘেরা সুনীল জলরাশির সাথে কিছুক্ষণ নিঃশব্দ বাক্যবিনিময়ের পর বিদায়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাহাড়ের ওপারে নামতে লাগলাম। বগামুখপাড়া পৌঁছতে ৪০ মিনিট লাগল। সেখানে পাহাড়ী কমলা কেনার পর চাঁদের গাড়ীর স্টান্ডে এসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। বেলা সাড়ে ৯টার দিকে দুটো চাঁদের গাড়ী আসল। একটি ছিল পর্যটকবাহী। সেটিতেই উঠলাম আমরা। গাড়ীতে যাত্রী কেবল আমরা ক'জনই। বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে উচু-নিচু পাহাড়ী রাস্তাটি অতিক্রম করে বেলা ১১টার দিকে রুমা বাজার পৌঁছলাম। আর্মী ক্যাম্পে রিপোর্ট করে 'আরণ্যক রিসোর্টে' রাখা আমাদের লাগেজগুলো গুছিয়ে নিলাম। হোটেল মালিক ও চেইন মাস্টারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাঙ্গুর ঘাটে অপেক্ষমান নৌকায় উঠে বসলাম। ঘাটে আসার সময় নাজীব রুমাবাজার মসজিদের লাইব্রেরীতে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইটি ঢুকিয়ে দিল। নৌকা ছাড়ল ঠিক ১১.৫০ শে। ঘাট থেকে তখন হাত নাড়াচ্ছে আমাদের ৩ দিনের সাথী গাইড আলমগীর ভাই।

ভাটির পথে মাত্র ৪০ মিনিটেই কাইখ্যাংঝিরি ঘাটে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে বেলা ১টায় বান্দরবানের উদ্দেশ্যে গাড়ী ছাড়ল। বেলা ৩টার ২/৩মিনিট পূর্বে বান্দরবান পৌঁছেই চট্টগ্রামগামী পূর্বাণী বাস পেয়ে গেলাম। ঠিক ৩টায় গাড়ী ছাড়ল। চলতি পথে বাস থেকেই স্বর্ণমন্দির ও মেঘলা অবকাশকেন্দ্র দেখলাম। অতঃপর চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট বাসস্টান্ডে এসে নামলাম বিকাল সাড়ে পাঁচটায়। সেখান থেকে এক সিএনজি নিয়ে কর্ণেলহাটে পৌঁছে শ্যামলী কাউন্টার থেকে রাজশাহীগামী ৭টার বাসে টিকিট কাটলাম। বাসে উঠেই ঘুম। পরের দিন সকাল সাড়ে ৮টায় নিরাপদেই ফিরে এলাম চিরচেনা রাজশাহী শহরে *ফালিল্লাহিল হামদ*। কিন্তু 'ব্যথার রাজ্যে জীবন গদ্যময়' রয়ে গেল পরবর্তী আরো কয়েকটা দিন। আর মনের গহীনে ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে যেতে লাগল সদ্য ফেলে আসা পাহাড়ী রাজ্যের স্বপ্নালু স্মৃতিগুলো।

একটি সিগন্যাল ও আমার আমি

-*অলি আহমাদ*
ইউনিভার্সিটি অব মালায়া,
কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া

ছেলেটির কোনো স্বপ্ন ছিলনা। কী জানি, ছিল হয়ত! তবে ওর চোখ দুটোতে কখনো স্বপ্নের আলোকচ্ছটা দেখিনি আমি। যে'কটা মুহূর্ত দেখছি, শীর্ণ আর কৃষ্ণবর্ণ ছেলেটিকে, শুধু ক্ষুধা আর অভাবে নিমজ্জিত কিছু কষ্ট দেখেছি। যার বহিঃপ্রকাশ কখনো বিষণ্ন ছিলনা, ছিল স্মিত এক হাসি।

আমি বেশিদিন নই ঢাকায়, পড়াশোনা করেছি দেশের বাহিরেই। এখন চাকরি করছি, ঢাকায়। নিজের দেশে ফিরে আসবার জন্যে চলে আসা।....তা আমি যেই হই। বাসে, ট্রেনে, গাড়ীতে অথবা রিক্সায়, দু'পাশে চোখ ভরে তাকিয়ে থাকাটাই আমার স্বভাব। আমি দেখতে থাকি, মানুষ, তাদের কাজ, গাছপালা... সব, সবকিছু। প্রতিদিন নিজে গাড়ী করে অফিস যাই আমি। সকাল ৮.৩০। আমি নিয়মিত একটি সিগন্যালে আটকে পড়ি। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে মাঝে-মাঝে ওখানে মিনিট পনের থেমে থাকার, কখনো বা বেশি। তিনমাস আগের সোমবার সকালটাও আলাদা কিছু ছিলনা। গুনগুন করে আনমনে কোন গানের কলি ভাজছিলাম, বেসুরো। হঠাৎ ঠক-ঠক শব্দে চমকে উঠলাম, বেশ বিরক্তও হলাম। কাঁচ নামিয়ে একটি নিস্পাপ মুখ দেখলাম, যেন কাঁদছে, একটি ছেলে। কিছু টকটকে গোলাপ উপরে তুলে বলল, 'স্যার, ফুল নিবেন, ফুল? তাজা রইছে, নিবেন?' না লাগবেনা বলে জানালা নামাচ্ছিলাম। ছেলেটি জানালাটা ধরে বলেই চলছিল, 'নেন না স্যার, দু'টা টাকা পাইলে খাইতে পারতাম, নেন না....স্যার...স্যার...' খেঁকিয়ে উঠলাম 'না রে বাবা, জ্বালাস না তো!' হাল ছেড়ে দিয়ে, মাথা নিচু করে ছেলেটা দৌড় দিল। নিঃশব্দে আমি জানালার কাঁচ উঠিয়ে দিলাম, সিগন্যাল সবুজ হয়েছে। পৌঁছে গেলাম, আমার নিয়ত জেলে, আমার কর্মস্থল। কর্মব্যস্ত প্রতিটি দিনে কোনকিছু ভাবার অবকাশ পাইনা কোনদিনই, আজও পেলাম না। দিনশেষে সেই ঘরে ফেরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে আনমনে কথা বলছিলাম নিজের সাথেই। নিজেকে বলছিলাম, আমি কতটা একা, কতটা অর্থহীন আমার জীবন। পরিবার থেকে সবসময় দূরে থেকেছি, এখনো তাই করছি....কেন? উত্তর জানা নেই আমার, আমি একা থাকি, স্বেচ্ছায়। তবে আমি একাকিত্ব বোধ করি, আর আমি এটা পছন্দ যে করি, তাও নয়। তবু আমি একা থাকি। নিজেও জানিনা কেন। নিজের জটিল মনের কাছ থেকে কোনদিন উত্তর পাইনি। আজও পাবো না জানি, অনর্থক প্রশ্নগুলো আমাকে পৌঁছে দিল ঘরের দরজার সামনে। কোনকিছু ঘটেনি যেন আজ, প্রতিটি দিনের মতই সবকিছু শূন্য। শুয়ে ছিলাম চোখ বন্ধ করে, আচমকা দুটি নিস্পাপ চোখ দেখতে পেলাম, সেই ছেলেটির। কেন অযথা খারাপ আচরণ করলাম? ওর তো দোষ নেই কোনো, এটাই ওর কাজ। আমরা সবাই তো ফেরি করে ফিরি। কেউ সামান্য ফুল, কেউ অন্যকিছু। আমি নিজেও যে কিছু অনুভূতির ফেরিওয়ালা.....

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এলার্ম-ঘড়িটা হিংসেয় জ্বলছিল নিশ্চয়। নয় তো এত গভীর ঘুমে হামলা দেয়ার নির্মমতা কেন? উঠে প্রস্তুত হয়ে নিলাম দ্রুত, অফিস আছে। সেই সিগন্যাল, আবার আমি। টোকা পড়তেই হেসে ফেললাম, আমার জীবনে সবকিছুই এমন, গৎবাধা, যা হবার, তাই হয়, অবিরাম। জানালা খুলে ছেলেটিকে দেখলাম, আমাকে দেখে চমকে উঠলো, চলে যাচ্ছিল ও। ডাক দিলাম ওকে, ঘুরে বলল, 'ডাকসেন স্যার??' ---হুমম, নাম কি তোমার? 'নাম দিয়া কি করবেন স্যার? ফুল নিবেন??' একশ টাকা দিলাম ওর হাতে, বললাম 'নামটা বলো এখন?' 'আমারে ছক্কু কয়, ফুল কয়টা দিমু স্যার?' আমি বললাম, 'আমার ফুল লাগবেনা।' 'তয় কি টেকা ফিরত লইবেন?' আমি বললাম, 'রাখো ঐটা, আচ্ছা তুমি এখন যাও।' এমন নির্মল আনন্দের হাসি আমি বোধ হয় বহুদিন দেখিনি, ওর চোখে-মুখে যেটা দেখেছি সেই মুহূর্তে। একছুটে ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেল ছক্কু। ওর আনন্দ আমাকে স্পর্শ করছিল খুব। কেমন যেন একটা সুখের অনুভব নিয়ে দিনটি কাটালাম আমি, একটু আলাদা।

আজ আমি আটকে পড়িনি সেখানে, একজন ছক্কুকে আমার মনে ছিলনা আদৌ। আমি আমার নিয়ত জীবনে ব্যস্ত হয়েছিলাম। দুদিন পরে, জানালায় উত্তেজিত থপ-থপ, ছক্কু!! 'কিরে, কেমন আছ তুমি?!' 'আমি ভালো আছি স্যার, আপনে ভালো আছেন?' মাথা নেড়ে সায় দেই আমি, বলি, কি চাও? 'কিছুনা স্যার, আপনের দেওয়া টেকা দিয়া মেলা দিন বাদে সেইদিন পেট ভইরা ভাত খাইছি, পত্তেকদিন চায়া খাই, হেইদিন কিন্না খাইসি।' বললাম, 'থাক কই?' 'ঐদিক।' কোনো দিক-নির্দেশ পাইনা আমি, হেসে দশ টাকা দিলাম, যাবার সময় হলো।

মাঝে মাঝেই দেখা হতো ওর সাথে, কখনো টাকা দিতাম কিছু, কখনো দিতাম না। একজন আরেকজনের কুশল বিনিময়ের একটা আজব সম্পর্ক ছিল আমাদের। অফিসে যাবার পথে, আমার পরিবার হয়ে দাঁড়ালো একসময়, ছোট্ট ওই হাসিমুখ ছেলেটি। একদিন আমাকে প্রশ্ন করে ও, 'আপনের অনেক টেকা তাইনা স্যার?' আমি বলি, 'ধুর না রে, আমি খুব সাধারণ মানুষ।' ও বলে, 'তাইলে আমারে যে টেকা দেন, গাড়িত করি আসেন?' আমি কিছু বলিনা, হাসি শুধু। ও বলে, স্যার, 'আপনে খুব ভালা মানুষ।' ওকে বিদায় করে আমি কাঁদি আপন মনে, নিজেকে বলি, যদি ছক্কুর কথা সত্য হত!! সবাই তো আমার থেকে দূরে চলে গেছে, বন্ধু, পরিবার। হয়ত.....আমি ভালো হলে যেতনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি আমি, হয়ত....ওরা নয়, আমি নিজেই নিজেকে খোলসে গুটিয়ে রেখেছিলাম.... হয়ত....এই হয়তগুলো আসলে অমিমাংসিত।

যাহোক অফিসে যাওয়ার পথে একদিন ভাবলাম আজ ফুল কিনব। কোনদিন ফুল নেয়া হয় নি ছক্কুর কাছ থেকে, আজ সবগুলো কিনব। সিগন্যালে আমি আটকে ছিলাম, মিনিট বিশেক, না, ছক্কুর টোকা পড়েনি সেদিন আমার গাড়ির কাঁচে। আমি আগে বাড়লাম। পরে আরো কয়েকদিন ফুল কেনার আশায় আমি অপেক্ষায় ছিলাম, সেই সিগন্যালে। কিন্তু না, সে আর আসে না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ওকে না দেখে কষ্ট পেতাম। ভাবতাম, আচমকা হয়ত আবার পড়বে টোকা। কিন্তু ছক্কু আর আসলই না। কোনদিন আর দেখিনি ওর নিস্পাপ মুখ, ক'টা টাকা পেয়ে নির্মল মধু হাসি। কোনদিন আর সে জিজ্ঞেস করেনি, 'স্যার, আপনে কেমন আছেন?'

এখন আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর স্ত্রীর একটাই অভিযোগ, আমি ওর জন্যে কোনদিন ফুল আনিনি। আমি উত্তরে বলি, 'ভালো ফুল পাইনা যে....।' আমি ছক্কুর ফুলগুলো কিনতে চাই, ওকে অনেক খুঁজেছি, পাইনি কখনো। আজও আমি ওর অপেক্ষা করে থাকি, সেই সিগন্যালে....।

বছরের সেরা সময় রামাযান উপস্থিত আবারো

-আমাতুল্লাহ
সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া।

একটি সামাজিক ওয়েবসাইটে ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান নিয়ে যেভাবে কনফ্রন্টেড হয়েছিলাম সেখানে রেজিস্ট্রেশনের একেবারে দ্বিতীয় দিন, সেরকম আগে কোথাও হইনি। এক সময় খুঁজে খুঁজে যখন ইসলাম নিয়ে কিছু বলা হলেই জবাব দেয়া শুরু করলাম, তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলাম, আমি কত কম জানি!

একদিন তর্কাতর্কির মাঝেই হঠাৎ থমকে গেলাম এক অদ্ভুত উপলব্ধিতে...কুরআনটা আমার তখনও পর্যন্ত নিজের ভাষায় আগাগোড়া পুরাটা একবার পড়া হয়নি! খতম করেছি তো ছোটবেলা, সে তো আছে। এখান থেকে সেখান থেকে দারস পড়েছি, ব্যাখ্যা

শুনেছি, অনুবাদ পড়েছি, কিন্তু কি আশ্চর্য, যেই আমি হাজার পৃষ্ঠার সুনীলের উপন্যাস কিংবা তার চেয়েও মোটা 'গন উইথ দ্যা উইন্ড' পড়ে ফেলতে পারি এক সপ্তাহে, সেই আমি জীবনের প্রায় দুই দশক পার করে ফেলেছিলাম কুরআনের মাত্র ছয় হাজার শব্দ আগা থেকে গোড়া রিডিং না পড়েই! অদ্ভুত লজ্জা নিয়ে কুরআনের অনুবাদ পড়া শুরু করেছিলাম সেই রমযানে, কয়েক বছর আগে। শুরু থেকে একটু একটু আরবীর সাথে অনেক বেশি করে অনুবাদ পড়া শুরু করলাম প্রতিদিন। আর সে কি বিস্ময়! কুরআনে অনেক কিছু এত সুন্দরভাবে বলা আছে, যেটা আমি আগে কখনও শুনিনি! যেমন-সূরা বাকারায় আল্লাহ যখন মুসলিমদের কাবার দিকে ফিরে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন কি সুন্দর করে বললেন, 'অবশ্যই নির্বোধ লোকেরা বলবে, 'এদের কি হয়েছে, প্রথমে এরা যে কিব্‌লার দিকে মুখ করে ছালাত পড়ত, তা থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? হে নবী! ওদেরকে বলে দাও, 'পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। আল্লাহ যাকে চান তাকে সোজা পথ দেখান।'... প্রথমে যে দিকে মুখ করে তুমি ছালাত পড়তে, তাকে তো আমি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে উল্টো দিকে ফিরে যায়, শুধু তা দেখার জন্য কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করেছিলাম *(সূরা বাকারা: ১৪২ ও ১৪৩ এর কিছু অংশ)*।

ব্লগে কত তর্ক করেছি যখন কাবার দিকে মুখ করে ছালাত পড়া নিয়ে লেখাগুলো আসতো, কিন্তু আমি যত কিছু বলেছি তার কিছু না বলে যদি এই দুইটা আয়াত বলে দিতাম, তাহলে সব বলা হয়ে যেত! আল্লাহ তো নিজেই বলছেন যে, তিনি সবদিকে আছেন, কিন্তু তবু তিনি চান আমরা কাবার দিকে ফিরে ছালাত পড়ি, শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাঁর কথার আনুগত্য করে!

গত রমযানে মোবাইলেই আস্ত কুরআনটা ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম। খুব ব্যস্ত ছিলাম তখন অনার্স ফাইনাল নিয়ে। ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পথে ট্রেনে কিংবা ল্যাবে এক্সপেরিমেন্টের ফাঁকে ফাঁকে আইপডে আরবী কুরআন শুনতাম আর সাথে সাথে ইংরেজি অনুবাদ পড়ে নিতাম মোবাইল থেকে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে কুরআন লিখিত ভাবে আসেনি, তাই কানে শোনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল আমার। ঠিক যেভাবে তিনি শুনেছিলেন চৌদ্দ'শ বছর আগে, সেভাবে শুনতে চাচ্ছিলাম! তেলাওয়াত শুনছিলাম মিশারী রাশিদ আল আফাসীর, সুবহানাল্লাহ! তাঁর তেলাওয়াত শোনার অভিজ্ঞতাই অন্যরকম। কুরআন পড়ার সময় তিনি সুর বদলান, যেখানে শুভ সংবাদের কথা সেখানে একরকম, যেখানে ভীতির কথা, সেখানে আরেক রকম। ছয় বছর আগে প্রথম তাঁর তেলাওয়াত শোনার আগ পর্যন্ত আমাকে কুরআন তেলাওয়াত তেমন টানতো না!

গত রমযানে পড়া একটা আয়াতের কথা এখনও মনে আছে... কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, কোন মেয়ের সতীত্বের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শাস্তি হচ্ছে আশি দোররা এবং অপবাদদানকারীকে সারাজীবনের জন্য মিথ্যাবাদী ঘোষণা দেয়া *(নূর ৪)*। শুধু তাই না, যারা শুধু অন্যজনের মুখে শুনে এই কথা আরেকজনকে বলে, তার ব্যাপারেও ভীষণ কঠিন সব কথা! ভীষণ রকমের অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আয়াতটা পড়ে! বার বার পড়লাম! একটা মেয়ের ব্যাপারে একটা কথা উঠলেই হয়েছে, সত্য হোক মিথ্যা হোক, মেয়েটার সারাজীবন ধ্বংস হয়ে যায়..এরকম ৮০% মুসলিমদের দেশে, প্রায় প্রতি বাড়িতে একটা করে কুরআন থাকা সত্ত্বেও! কি আশ্চর্য! মেয়েদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত আমি প্রথম শুনেছি/উপলব্ধি করেছি জীবনের দুই যুগ পার হয়ে যাওয়ার পরে!!! কি ভয়াবহ লজ্জা!!! তাও আমার হাতের কাছেই কুরআন থাকে, জ্ঞানার্জনের পথ-পন্থা এত বেশি, তবুও! বাংলাদেশের যেই নিরপরাধ মেয়েগুলো মুখ বুজে দোররা খেয়ে যাচ্ছে, তাদের হাতে কি কেউ একটা করে কুরআন তুলে দিতে পারে না যুদ্ধ করার জন্য!

রমযানে, বছরের সেরা দিনগুলোতে আল্লাহ কুরআন পাঠিয়েছিলেন আমাদের জন্য। প্রতি রমযানে তাই একটু একটু চেষ্টা করি কুরআন সম্পর্কে আরেকটু জানার। যত জানি, তত মুগ্ধ হই।

এবার এক বন্ধুর কাছ থেকে দারুণ একটা আইডিয়া পেলাম। সে কুরআন পড়বে কুরআন ঠিক যেভাবে এসেছে, সেভাবে। আমাদের কাছে এখন যেভাবে কুরআন আছে, সেভাবে কুরআন রাসুল (ছাঃ)-এর কাছে আসেনি। অনেক সূরাই আগে পিছে, রাসূল (ছাঃ) সেটা পরে সাজিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর নির্দেশে। সূরা ফাতিহা এসেছে অনেক পরে, কিন্তু একেবারে প্রথম সূরা এখন। সূরা আলাক এসেছে একেবারে প্রথমে, কিন্তু এখন একেবারে শেষের দিকে। কুরআন যেই ধারাতে এসেছে, সেই ধারাতে কুরআন পড়লে ঠিক কিভাবে ইসলাম রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসেছিল, সেই ধারণাটা পরিষ্কার হতে পারে অনেক।

অনেক সময় কুরআন পড়তে গেলে খুব রিপিটিটিভ ঠেকে, মনে হয় একই কথা তো পড়ে এসেছি দশ পাতা আগেও! কিন্তু সেই কথাটা কেন আল্লাহ আরেকবার বলছেন দশ পাতা আগে, সেটা যদি জানা যায় কুরআনের ব্যাখ্যা পড়ে, তাহলে নিজেরই মাথায় বাড়ি দিতে ইচ্ছা করে স্রেফ পুনরাবৃত্তি ভাবার জন্য! ইবনে কাছীরের তাফসীরের বাংলা অনুবাদ কেমন আমি জানি না। আপাতত: আমি ইবনে কাছীরের ইংরেজি অনুবাদ পড়ছি। যত পড়ছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি!

আরেকটা জিনিস আমার হয়ত এই রমযানে ধরা হবে না, কিন্তু খুব ইচ্ছা আছে কখনও শুরু এবং শেষ করার! সম্প্রতি এক বই পেয়েছি যেখানে মাত্র কয়েকশ শব্দ আছে, যেগুলো শিখলে কুরআনের ৮০% শব্দ শেখা হয়ে যাবে (কারণ কুরআনে একই শব্দ অনেকবার এসেছে)! আমি ভাবতেও পারি না, যেই কুরআন যুগ যুগ ধরে আমরা মাটিতে ছুঁতে দেইনি, সবচেয়ে উঁচু শেলফে রেখে দিয়েছি, ওযূ ছাড়া ছুঁয়েও দেখিনি, সেই কুরআনের ৮০% অনুবাদ ছাড়া শুধুমাত্র পড়েই বুঝে ফেলার অনুভূতি কেমন হবে! কিন্তু সত্যি, খুব ইচ্ছা করে সেই অভিজ্ঞতা লাভের।

বছরের সেরা দিনগুলো এসে গেছে... যখন ছোট ছিলাম, তখন ছিয়াম আসত আর যেতো, না খেয়ে থাকার উপলব্ধি আর ঈদের নতুন জামার আনন্দের চেয়ে বড় কিছু 'রামাযান' থেকে আমি পাইনি। আস্তে আস্তে যখন জানলাম, এটা শুধু 'রামাযান' মাস না, বছরের সেরা দিনগুলো...তখন দিনগুলো চলে গেলে ভীষণ বিষণ্নতায় ভুগতাম। কেন জানেন? এই দিনগুলোতে শয়তানগুলো বন্দী থাকে সব। কিন্তু কি আশ্চর্য, শয়তানের অনুপস্থিতিতেও আমার কাজে, চিন্তায়, মেজাজে বড় সড় ধরনের কোন পরিবর্তন আসত না! যখন ভিতরে চোরা ভয়টা ঢুকে যাওয়া শুরু করলো, শয়তানটা আসলেই হয়তো আমার মনটাকে ইচ্ছে মত বাগিয়ে নিয়েছে, তখন থেকেই ঈদের দিন যত আগাতো তত বেশি বিষণ্নতায় ভুগতাম! এবার ভীষণ ইচ্ছা ঈদের দিন জোরেসোরে একটা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা... এই সুন্দর মাসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তারপরে। পারব কি না জানি না!!!

বন্ধুর কাছ থেকে আরেকটা আইডিয়া পেয়েছি, এটা বলে শেষ করছি। রমযানে দোআ কবুলের সময়ের ছড়াছড়ি। ছিয়াম রাখলে ইফতারের সময়, তারাবীর পরে, সেহেরীর আগে, শেষ দশদিনের রাতগুলোতে। এই সময়গুলোতে আল্লাহ্‌র কাছে হাত তুলে কিছু চাইলে সত্যি মনে হয় আল্লাহ শুনছেন! অসংখ্য প্রমাণ আছে আমার নিজের জীবনে। অসম্ভব সব কিছু চেয়ে দিব্যি পেয়ে গিয়েছি...এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলছি না কিন্তু...। যারা ওই সময়গুলো মিস করছেন, তারা সত্যিই মিস করছেন...।

বন্ধুটি এবার বললো, যত যা কিছু আছে, একটা লিস্ট করে প্রতিদিন চেয়ে যাও। আল্লাহ যদি একদিন দো'আ কবুল করেন, তাহলে বাকি ঊনত্রিশ দিনে কোন কারণে তোমার ছিয়াম আল্লাহ পছন্দ না করলেও কোন অসুবিধা নেই, ওই একদিনে তো দোআগুলো সব কবুল হয়ে যাবে! আইডিয়াটা সত্যিই ভালো! আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্র সংবাদ

কেন্দ্রীয় সভাপতির মাসব্যাপী ভারত সফর

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন গত ৭ই মার্চ পীস টিভির প্রোগ্রাম রেকর্ডিং এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যেলায় দাওয়াতী সফরের উদ্দেশ্যে ভারত গমন করেন। সফরের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি দিল্লী, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আহলেহাদীছ মাদরাসা ও সাংগঠনিক অফিসসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি মাওলানা ছালাহুদ্দীন মাক্বুবুল ইউসুফ, মাওলানা মাহফূযুর রহমান, মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফীসহ ইণ্ডিয়ার বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও ইণ্ডিয়ার বিখ্যাত আহলেহাদীছ মাদরাসা জামে'আ সালাফিয়া বানারাস, জামে'আ ফয়যে আম, মউ-সহ বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে তাঁর মতবিনিময় হয়। সফরের শেষ পর্যায়ে মালদা, নদীয়া, কলিকাতা ও মেটিয়াবুরুজে সেদেশের আহলেহাদীছ যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে তিনি কয়েকটি সাংগঠনিক বৈঠক ও প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করেন। মাসব্যাপী সফর শেষে তিনি ১২ই এপ্রিল দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মিছবাহুল ইসলাম, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক হাসীবুল ইসলাম, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক আব্দুর রাকীব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, সহ-পরিচালক বযলুর রহমান, 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলা সভাপতি হুমায়ন আহমাদ এবং 'যুবসংঘ' রাবি অর্থ সম্পাদক আবু তাহেরসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

শাপলা চত্বরে আলেম-ওলামাদের ওপর পুলিশী তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা

রাজশাহী, ৭ মে মঙ্গলবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মহসিন ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এক বিবৃতিতে ১৩ দফা দাবী আদায়ের জন্য আহূত হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচিতে ক্ষমতাসীন সরকারের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তারা বলেন, এ দেশের আপামর ধর্মপ্রাণ জনতার প্রাণের দাবীকে অগ্রাহ্য করে এবং ইসলামী আইন ও বিধানের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বর্তমান সরকার জনমনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল, তারই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল শাপলা চত্বরে। এই শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার দিনব্যাপী সাধারণ মানুষের উপর যে প্রাণঘাতী মারণাস্ত্রের ব্যবহার করেছে এবং সবশেষে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র আলেম-ওলামার প্রতি যে রক্তাক্ত আগ্রাসন ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তা রীতিমত পৈশাচিক। তারা বলেন, এই নির্মম যুলুমের দায়ভার সরকারকেই বহন করতে হবে। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবী করেন এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করতঃ অবিলম্বে ইসলামপ্রিয় জনতার গণদাবীকে মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি*।

প্রাথমিক সদস্য, কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মানোন্নয়ন পরীক্ষা ২০১৩

দেশব্যাপী কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক সদস্য, কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মানোন্নয়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৮ জুন ২০১৩। এবারই প্রথম কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক সদস্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এছাড়াও কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পরীক্ষার সিলেবাস ও নীতিমালাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য উভয় মানোন্নয়ন পরীক্ষা দু'টি ধাপে গ্রহণ করা হবে। যথাসময়ে সকল পর্যায়ের মানোন্নায়নপ্রার্থীদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য স্ব স্ব যেলা দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

যেলা সংবাদ

মৌগাছি, রাজশাহী ১৯ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০টা থেকে রাজশাহী (উত্তর) যেলা-এর আয়োজনে কেশরহাট থানার মৌগাছি হাইস্কুল মিলনায়তনে এক দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম। রাজশাহী (উত্তর) যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাকীমের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে আরো উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, ধুরইল উপযেলা 'আন্দোলন'এর সভাপতি মাওলানা দুরুল হুদা এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। প্রশিক্ষণে যেলার বিভিন্ন উপযেলা, এলাকা ও শাখা 'যুবসংঘ'-এর কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

নলডাঙ্গা, নাটোর ৩ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আসর থেকে 'যুবসংঘ' নাটোর যেলা কর্তৃক আয়োজিত নলডাঙ্গা উপযেলার ব্রক্ষপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। নাটোর যেলা সহ-সভাপতি বুলবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। সমাবেশে যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০ মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০টা থেকে মাগরিবপূর্ব পর্যন্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জ (উত্তর) যেলা-এর আয়োজনে রহনপুর জালিবাগান মাদরাসা প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলা (উত্তর) সভাপতি মুহাম্মাদ মুখতার হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। প্রশিক্ষণে যেলার বিভিন্ন উপযেলা, এলাকা ও শাখা 'যুবসংঘ'-এর কর্মী ও সুধীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ইসলামপুর, জামালপুর ২৬ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ জামালপুর (উত্তর) যেলা-এর আয়োজনে ইসলামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী ও নওদাপাড়া মারকায শাখা প্রচার সম্পাদক তামীমুল ইসলাম। জামালপুর (উত্তর) যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন জামালপুর যেলা 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

এলাকা সংবাদ

পাঁচদোনা, নরসিংদী ১৯ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাঁচদোনা এলাকা কমিটি গঠন ও

বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ বিন ইসহাক, সাধারণ সম্পাদক দেলোওয়ার হোসাইন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক হাফেয শরীফুল ইসলাম এবং 'সোনামণি' যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ আহমাদ ইসহাক প্রমুখ। পরিশেষে মুহাম্মাদ আব্দুল মুহায়মিনকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট পাঁচদোনা এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

ভাদুড়িয়া, কেশরহাট, রাজশাহী ২৯ এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ভাদুড়িয়া এলাকা কর্তৃক আয়োজিত ভাদুড়িয়া পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাকীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী মহানগরী শাখার সাধারাণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীন ও বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ ও কর্মী ও সুধীমণ্ডলী।

শাখা সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে যুবসংঘ 'মারকায' এলাকার পাঠাগার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর মারকায এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ আসিফ রেযা-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বারী, রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম, রাজশাহী মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুনসহ মারকায এলাকা ও বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীলবৃন্দ।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩ এপ্রিল বুধবার : অদ্য আছর দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক সাপ্তাহিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আসিফ রেযা-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মারকায এলাকা 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

শেখপাড়া, রাজশাহী ১৯ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'শাখা পুনর্গঠন' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র শাখার দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ। পরিশেষে আবু রায়হানকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ যাকারিয়া হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট শেখপাড়া শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' গ্রন্থের উপর **'গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৩'**-এর ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও রাবি শাখার সভাপতি মিছবাহুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাকীব ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর রাবি শাখার সহ-সভাপতি ছাদিক মাহমূদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তাহেরসহ রাবি শাখার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রবৃন্দ। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ মোট দশজনকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হল−হানযালা (দাওরায়ে হাদীছ, প্রথম), আকরাম হোসাইন (দাওরায়ে হাদীছ, দ্বিতীয়), শাহিন রেযা (১০ম শ্রেণী, তৃতীয়)।

চোরকোল, ঝিনাইদহ ৩১ মে শুক্রবার: অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চোরকোল শাখার উদ্যোগে চোরকোল বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ মিলন আখতার (আসাদুল্লাহ)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হারুনুর রশীদ। অনুষ্ঠান শেষে ইকরামুল হককে সভাপতি, নাজমুল হুসাইনকে সহ-সভাপতি ও প্লাবনকে সাধারণ সম্পাদক করে নয় সদস্য বিশিষ্ট 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চোরকোল শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতা ২০১৩

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্রদের জন্য একটি কুইজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যুবসংঘ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল মতীন এবং সাধারণ সম্পাদক মুকাররবম বিন মুহসিন জানান, উচ্চ শিক্ষার্থে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমণকারী মারকাযের প্রাক্তন ছাত্রদের সাথে বর্তমান ছাত্রদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি ও ছাত্রদের জ্ঞানচর্চার বহুমুখী সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আগামী ১২ই জুন মারকাযে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

যখনই গায়েব বা পরকালীন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন সন্দেহের উদয় হবে, তখন এটাই মনে করতে হবে যে, এ প্রশ্নে উত্তর এখন না জানা থাকলেও তা সময়মত অবশ্যই জানা যাবে। যেমন শিক্ষক পরীক্ষাকালীন সময়ে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদানে নিরব থাকেন। এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষক সেখানে অনুপস্থিত রয়েছেন বা তিনি প্রশ্নের উত্তর অবগত নন।

সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

নাস্তিকদের বিরুদ্ধে হেফাযতে ইসলামের মাসব্যাপী আন্দোলনকে ফিল্মি স্টাইলে রক্তাক্তভাবে দমন করল বাংলাদেশ সরকার

গত ৫ই মে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে গড়ে ওঠা সবচেয়ে শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলনটির আপাতত পরিসমাপ্তি ঘটল এক রক্তাক্ত ট্রাজেডীর মাধ্যমে। ব্লগে ও ইন্টারনেটে রাসূল (ছাঃ)-এর অবমাননা এবং শাহবাগে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও নাস্তিক্যবাদের প্রচারের বিরুদ্ধে সারাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতার যে গণজোয়ার উঠেছিল, তা যে এমন পরিণতি লাভ করবে তা ৫ই মে'র আগ পর্যন্ত কল্পনা করা যায়নি। একমাস পূর্বে হেফাজতে ইসলাম ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক ৫ই মে ছিল ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী। সারাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতার জেগে ওঠার এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তকে অধীর আগ্রহে পর্যবেক্ষণ করছিল সর্বস্তরের মানুষ। একটা লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনের আশায় বুক বেঁধেছিল সবাই। কিন্তু শান্তিপূর্ণ অবরোধ কর্মসূচী শেষ হবার পর সেদিন দুপুরে হঠাৎ করে পল্টন এলাকায় হেফাযত কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। অপরদিকে অজ্ঞাত দুস্কৃতিকারীরা বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুর্ব পরিকল্পিতভাবে নাশকতা সৃষ্টি করে এবং এর জন্য সমস্ত মিডিয়ায় হেফাজত কর্মীদের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা চালানো হয়। দিনব্যাপী এসব অঘটনের পর রাতে হেফাযতকর্মীরা শাপলা চত্বরে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। সবাই অপেক্ষা করতে থাকে পরদিন কি ঘটে তা নিয়ে। কিন্তু সেদিনই দিবাগত রাত আড়াইটা নাগাদ পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির প্রায় ৮ হাযার সদস্য অকস্মাৎভাবে শাহবাগ চত্বরে বিশ্রামে থাকা লাখো জনতার উপর বৃষ্টির মত গুলি, সাউণ্ড গ্রেনেড ও টিয়ার গ্যাস সেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে শাহবাগ চত্বরে সৃষ্টি হয় এক নৃশংস ও নারকীয় দৃশ্য। নিহত ও আহত হয় হাযারো মানুষ। সরকারের এই হিংস্র তাণ্ডবে সারাদেশ হতবাক হয়ে পড়ে। এই রক্তাক্ত ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে হেফাজত ইসলামের সম্ভাবনাময় মাসব্যাপী আন্দোলনের দৃশ্যত পরিসমাপ্তি ঘটল।

জর্দানে মহিলা হিফয প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ১ম

জর্দানের রাজধানী আম্মানে বিশ্বের নির্বাচিত নিজ নিজ দেশে প্রথম স্থান অধিকারকারীনী বালিকা হাফেযাদের মধ্যে ৪৩টি দেশের হাফেযাদের পরাজিত করে উপস্থিত দর্শক ও বিচারকদের মন জয় করে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাংলাদেশের খুদে বালিকা হাফেযা ফারিহা তাসনীম। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সঊদী আরব এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে লিবিয়া। প্রথম স্থান অধিকারীনী ফারিহা তাসনীম মাত্র ছয় বছর বয়সেই নেছার আহমাদ আন-নাছিরী কর্তৃক পরিচালিত মারকাযুত তাহফীজ ইন্টারন্যাশনালে কুরআন হিফয করতে সক্ষম হয়।

এ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জর্দানের ধর্মমন্ত্রী ড. মুহাম্মাদ নূহ এবং কূটনৈতিক, রাষ্ট্রদূত, সরকারী কর্মকর্তা ও দেশ-বিদেশী রাষ্ট্রীয় মেহমানগণ। ধর্মমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ নূহ বিশ্বসেরা হাফেযা ফারিহা তাসনিমকে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ প্রদান করেন। তিনি বিশ্বের সেরা হাফেযা ফারীহা তাসনীমের প্রশংসা করে বলেন, সৌদি আরবে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় ৭৩টি দেশের মধ্যে একাধিক গ্রুপে বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার করার পর এবার জর্দানেও বাংলাদেশী মেয়ে হাফেযা প্রথম স্থান অধিকার করায় আমি মুগ্ধ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের হাফেয ছেলেদের সঙ্গে হাফেযা মেয়েরাও বিশ্ব কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করছে। আমি বাংলাদেশের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছি।

লণ্ডনের উলউইচে সন্ত্রাসী হামলা

গত ২২ মে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ-পূর্ব লন্ডনে প্রকাশ্যে রাস্তায় দুই সন্ত্রাসী ছুরিকাঘাতে লি রাগবি নামের ২০ বছর বয়সী এক বৃটিশ সেনাকে হত্যা করেছে। নিহত ব্যক্তি উলউইচ রয়েল আর্টিলারি ব্যারাকের সেনা সদস্য ছিলেন। ঘটনাস্থলের ফুটেজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি রক্তমাখা মাংস কাটার ছুরি উঁচিয়ে ধরে বলছে, 'তারা আমাদের বিরুদ্ধে হামলা করলে আমাদেরও পাল্টা হামলা করতে হবে। চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত ফেলতে হবে।' ওই লোকটি আরও বলছিল, 'মহিলাদের আজ এমন দৃশ্য দেখতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমাদের দেশের মহিলাদেরও এমন দৃশ্য দেখতে হয়। তোমরা কখনও নিরাপদ অনুভব করবে না। তোমাদের সরকারকে উৎখাত করো। তারা তোমাদের কথা ভাবে না।' বিবিসি জানায়, হামলাকারীরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল। প্রত্যক্ষদর্শী জেমস জানান, এ হামলার পর দুই লোক প্রকাশ্যে ছুরি উঁচিয়ে আশপাশের লোকজনকে তাদের ছবি তোলার আহ্বান জানাচ্ছিল। পুলিশ জানিয়েছে হামলাকারী মাইকেল এডিবলোজা (২৮) ও তার সতীর্থ দু'জনই বৃটিশ নাইজেরিয়ান মুসলিম।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এ হামলার নিন্দা করে বলেন, ইসলাম এ ধরনের ঘটনা সমর্থন করে না। তিনি আরো বলেন, এ ঘটনা শুধু বৃটেনের উপরই আক্রমণ নয়, এটা ইসলাম ও মুসলিম কমিউনিটির জন্য বিদ্রূপের বিষয়। মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে অত্যন্ত নৃশংস বলে উল্লেখ করেছে। ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ ইষ্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টার এক বিবৃতিতে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, জঘন্য এই অপরাধের কোন যুক্তি নেই। অপরাধী বা হত্যাকারীরা কোন সম্প্রদায় বা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না। এদিকে এ ঘটনার পর বর্ণবাদী ইডিএল (ইংলিশ ডিফেন্স লীগ) উলউইচ ও নিউহাম এলাকায় বিক্ষোভ করে। তারা কয়েকদিন ধরে মুসলিম অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে আক্রমণ করার হুমকি দেয়। এরই প্রেক্ষিতে গত ৫ই জুন লণ্ডনের আল-রহমা ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড মসজিদটি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ফেইথ মেটার্স-এর তথ্য মতে বৃটিশ সেনা নিহত হওয়ার পর বৃটেনে দুই সপ্তাহের মধ্যে ২২২টি মুসলিম বিদ্বেষী ঘটনা ও ১২টি মসজিদে হামলা চালানো হয়েছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন নওয়াজ শরীফ

পাকিস্তানে ইতিহাস গড়লেন নওয়াজ শরীফ। পাকিস্তান মুসলিম লীগের (পিএমএল-এন) প্রধান নওয়াজ শরীফ তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন। পাকিস্তানের ১৮তম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর নওয়াজ শরীফ বলেছেন, মানুষ যে আকাংক্ষা নিয়ে তার দলকে ভোট দিয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাই হবে তার মূল কাজ। নওয়াজ শরীফ জাতীয় পরিষদে ২৪৪ ভোট পেয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) প্রার্থী মাখদুম আমীন ফাহিম ৪২ ভোট এবং পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রার্থী পেয়েছেন ৩১ ভোট। ১৯৮০ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন নওয়াজ শরীফ। এরপর পাঞ্জাব প্রদেশের অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান নওয়াজ। ১৯৯৩ সালে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। এরপর ১৯৯৭ সালে আবার প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৯৯ সালের ১২ অক্টোবর সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন নওয়াজ। এরপর সাত বছর স্বেচ্ছানির্বাসন শেষে ২০০৭ সালে দেশে ফেরেন তিনি। গত ১১ মে'র নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয় তার দল।

বায়ার্ন মিউনিখ ক্লাবের স্টেডিয়ামে নির্মিত হবে মসজিদ

জার্মানীর বিখ্যাত বায়ার্ন মিউনিখ ক্লাব একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফরাসী জাতীয় ফুটবল টিম ও এ দলের বিখ্যাত মুসলিম তারকা ফুটবলার ফ্রাঙ্ক রিবেরীর প্রস্তাবে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বুন্দেস লিগার বায়ার্ন মিউনিখ টিমের সদস্য ফরাসী ফুটবল তারকা ২০০৬ সালে মুসলমান হন এবং তিনি 'বেলাল ইউসুফ মুহাম্মাদ' নাম বেছে নেন। বিয়ে করেছিলেন মরক্কোয় জন্ম নেয়া মুসলিম মেয়েকে। মুসলমান খেলোয়াড়দের ছালাত আদায়ের সুবিধার জন্য একটা ছোট রুমের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন রিবেরি। তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে বায়ার্ন কর্তৃপক্ষ প্রার্থনার জন্য কক্ষ নয়, নিজস্ব স্টেডিয়াম এলিয়ান্স আরেনায় পরিপূর্ণ একটা মসজিদ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে, যেখানে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি সমর্থকরাও ছালাত আদায় করতে পারবেন। শুধু তা-ই নয়, একজন ইমামও নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে বায়ার্নের। ইসলামী বই সমৃদ্ধ একটা লাইব্রেরীও থাকবে পাশেই, থাকবে ধর্মীয় আলোচনার সুযোগও। এ মসজিদ নির্মাণের ৮৫% খরচ বায়ার্ন মিউনিখ কর্তৃপক্ষ বহন করবে এবং মুসলিম ফুটবলার ও দর্শকরা অবশিষ্ট অর্থ প্রদান করবেন। বলাবাহুল্য, এর পূর্বে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের 'নিউক্যাসল' টিমও মুসলিম ফুটবলারদের জন্য প্রার্থনাঘর নির্মাণ করেছে।

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রথম সম্পূর্ণ বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দেন কে?
উত্তর : প্রণব মুখার্জি (ভারত); ৪ মার্চ ২০১৩।

২. প্রশ্ন : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত স্বাক্ষরতা মূল্যায়ন জরিপ ২০১১ অনুসারে দেশে সাক্ষরতার হার কত?
উত্তর : ৫৩.৭% নারী এবং পুরুষ ৫৬.৯% ।

৩. প্রশ্ন : টুয়েসডে গ্রুপ কি?
উত্তর : বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী কূটনীতিকদের একটি গ্রুপ। প্রতি মঙ্গলবার এ গ্রুপটি বৈঠক করে বলে এটি 'টুয়েসডে গ্রুপ' নামে পরিচিত।

৪. প্রশ্ন : বাংলা সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট বেশতো (Beshto) চালু হয় কবে?
উত্তর : ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

৫. প্রশ্ন : ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে 'মডেল যেলা বাজেট' কার্যক্রম চালু করেছে কোন যেলা?
উত্তর : টাঙ্গাইল।

৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রথম কৃষি-বহির্ভূত অর্থনৈতিক শুমারী অনুষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১৯৮৬ সালে।

৭. প্রশ্ন : বাংলা টাউন কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : লন্ডন, যুক্তরাজ্য।

৮. প্রশ্ন : সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি ইন্তেকাল করলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কে?
উত্তর : জাতীয় সংসদের স্পিকার।

৯. প্রশ্ন : দেশের কোন দু'টি যেলা কুষ্ঠপ্রবণ?
উত্তর : গাইবান্ধা ও নীলফামারী।

১০. প্রশ্ন : কবি কাজী নজরুল ইসলামের সদ্য প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম কি?
উত্তর : নির্ঝর।

১১. প্রশ্ন : বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন কয়জন এবং কোন কোন রাষ্ট্রপতি মারা গেছেন?
উত্তর : তিনজন। (১) শেখ মুজিবর রহমান (২) জিয়াউর রহমান (৩) মোঃ জিল্লুর রহমান।

১২. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান কততম রাষ্ট্রপতি ছিলেন?
উত্তর : ১৯ তম।

১৩. বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি কে?
উত্তর : এ্যাডভোকেট আব্দুল হামীদ (২০তম)।

১৪. প্রশ্ন : টর্নেডো সর্বোচ্চ কতক্ষণ স্থায়ী হ'তে পারে?
উত্তর : ১৫ মিনিট।

১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশের কতটি যেলার কতটি উপযেলা সরাসরি সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত?
উত্তর : ১২টি যেলার ৪৮ টি উপযেলা।

১৬. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর : ৭১ টি।

১৭. প্রশ্ন : দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের অধীনে মোট কয়টি মসজিদ রয়েছে?
উত্তর : তিনটি।

১৮. প্রশ্ন : দেশের প্রথম পক্ষীশালা কোথায় নির্মিত হচ্ছে?
উত্তর : চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায়।

১৯. প্রশ্ন : এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি?
উত্তর : বরিশাল-পটুয়াখালী খামার।

২০. প্রশ্ন : বানৌজা দুর্জয় ও বানৌজা নির্মূল কি?
উত্তর : বাংলাদেশের নৌবাহিনীতে যুক্ত হওয়া নতুন যুদ্ধজাহাজ।

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী)

১. প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এর পরিবর্তিত নাম কি?
উত্তর : ইন্টারন্যাশনাল নিউইয়র্ক টাইম।

২. প্রশ্ন : মুক্ত অপারেটিং সফটওয়্যার অ্যানড্রোয়েড (Android)-এর উদ্ভাবক কে?
উত্তর : অ্যান্ডি রুবিন ও রিচ মিনার (২০০৩ সালে তৈরি করা হয় এবং ১৭ আগষ্ট ২০০৭ গুগল এটি কিনে নেয়)

৩. প্রশ্ন : চীনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : লি কেরিয়াং

৪. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেলের নাম কি এবং কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জে ডব্লিউ ম্যারিয়ট মারকুয়িস (উচ্চতা ৩৫৫ মিটার); দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

৫. প্রশ্ন : বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কোন নেতাদের লাশ মমি করে রাখা হয়েছে?
উত্তর : ভিয়েতনামের হো চি মিন, রাশিয়ার লেলিন, চীনের মাও সে তুং, উত্তর কোরিয়ার কিম জং ইল এবং ফিলিপাইনের ফার্নিনান্ড মার্কোস।

৬. প্রশ্ন : অস্ত্র রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয় রাশিয়া)।

৭. প্রশ্ন : ২০১৩ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ ও নিম্ন দেশ কোনটি?
উত্তর : শীর্ষ দেশ : কাতার (৮৭,৪৭৮ মার্কিন ডলার); নিম্ন দেশ : গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (৩১৯ মার্কিন ডলার)।

৮. প্রশ্ন : সিঙ্কহোল কি?
উত্তর : ভূপৃষ্ঠে আচমকা তৈরী হওয়া বিশাল গর্ত।

৯. প্রশ্ন : পি ৫+১ বলতে কি বুঝায়?
উত্তর : যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স রাশিয়া ও জার্মানি এবং ইরান সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বব্যাপী পি ৫+১ নামে পরিচিত।

১০. প্রশ্ন : গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : জাপান।

১১. প্রশ্ন : রোমান ক্যাথলিকদের ২৬৬ তম পোপ ফ্রান্সিসের আসল নাম কি?
উত্তর : হোর্হে মারিও বেরগোগলিও।

১২. প্রশ্ন : 'আফ্রিকার আধুনিক সাহিত্যের জনক' বলা হয় কাকে?
উত্তর : চিনুয়া আচেবে।

১৩. প্রশ্ন : ভারত মহাসাগরের নীচে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া প্রাচীন মহাদেশের নাম কি?
উত্তর : মরিশিয়া।

১৪. প্রশ্ন : আরব বসন্ত (Arab Spring)-এর সূতিকাগার কোন দেশ?
উত্তর : তিউনিশিয়া।

১৫. প্রশ্ন : আরব বসন্তের অন্য নাম কি?
উত্তর : জুঁই বিপ্লব (Jasmine Revolution)।

১৬. প্রশ্ন : বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে এমন সফটওয়ারের নাম কি?
উত্তর : জ্যোতিষী সফটওয়ার।

১৭. প্রশ্ন : মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নারী জাদুঘরটির নাম কি?
উত্তর : বাইত আল বানাত বা নারী ঘর।

১৮. প্রশ্ন : সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যার আবিষ্কারক কে?
উত্তর : গণিতবিদ কার্টিস কুপার (যুক্তরাষ্ট্র); সংখ্যাটির ডিজিট ১,৭৪,২৫,১৭০টি।

১৯. প্রশ্ন : ২০১২ সালে বিশ্বে স্বর্ণ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

২০. প্রশ্ন : বিশ্বে স্বর্ণ ব্যবহারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।

আইকিউ

[কুইজ-১ এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ৩০শে জুনের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/১ :

১. ইমাম আবু হানিফার জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
ক. ৭০-১৫০ হিঃ খ. ৮০-১৬০ হিঃ গ. ৮০-১৫০ হিঃ ঘ. ৯০-১৫০ হিঃ।

২. সিরিয়ার বর্তমান কি?
ক. মস্কো খ. লিবিয়া গ. ইরাক ঘ. ফিলিস্তীন

৩. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঐতিহাসিক ১ম জাতীয় সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক. ১৯৭৮ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল খ. ১৯৭৮ সালের ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী গ. ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল ঘ. ১৯৮৯ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল।

৪. ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ কবে স্বাধীনতা লাভ করে?
ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৪৮ সালে গ. ১৯৪৫০ সালে ঘ. ১৯৪৯ সালে।

৫. শিশুদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণ কয়টি?
ক. ১০টি খ. ১৫টি গ. ১৯টি ঘ. ২০টি।

৬. ভূ-পর্যটক মাকদেসী কখন সিন্ধু ভ্রমণে আসেন?
ক. ৪৭৫ হিঃ খ. ৫৭৫ হিঃ গ. ৩৭৫ হিঃ ঘ. ২৭৫ হিঃ।

৭. দক্ষিণ ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলন কয়ভাগে বিভক্ত?
ক. দুইভাগে খ. পাঁচভাগে গ. তিনভাগে ঘ. সাতভাগে।

৮. বর্তমানে বাংলাদেশে কতজন শিশু-কিশোর রয়েছে?
ক. ১০ কোটি খ. ৭ কোটি গ. ৫ কোটি ঘ. ৮ কোটি।

৯. 'ফাৎহুল বারী'র হস্তলিখিত কপি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে কবে আসে?
ক. ৯১৮ হিঃ/১৫১২ খ্রিঃ খ. ৯১৭ হিঃ/১৫১১ খ্রিঃ গ. ৯১৯ হিঃ/১৫১৩ খ্রিঃ ঘ. ৯২০ হিঃ/১৫১৫ খ্রিঃ।

১০. তাক্বলীদ কয় প্রকার?
ক. তিন প্রকার খ. চার প্রকার গ. দুই প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার।

বর্ণের খেলা ১/১ :

[বর্ণের খেলাটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ৩০শে জুনের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ১০ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে ব্যক্তির নাম দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে অন্য একটি ব্যক্তির নাম পাবেন।

১.....
২.....
৩.....
৪.....
অদৃশ্যে থাকা নাম.....

শব্দজট ১/১ :

[শব্দজটটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ৩০শে জুনের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান, ১০ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

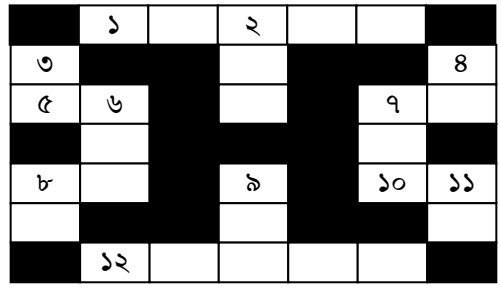

পাশাপাশি :

১. ডুবে মরা ফেরাউনের নাম ৫. ঈশ্বর/প্রভু ৭. এক প্রকার দ্রুতগামী বিমান ৮. তাম্বুল ১০. হিতকর/কল্যাণ কর ১২. সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক।

উপর-নীচ :

২. অবশ্যই পালনীয় ৩. যা প্রতিদিন আল্লাহ্র হুকুমে উদিত হয় ৪. জলাশয়াদিতে অবতরণের জায়গা ৬. বজ্রপাতের দেশ ৭. সম্মেলনের শহর ৮. খন্ড/পরিচ্ছেদ ৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাদির নাম ১১. ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যা।

সংখ্যা প্রতিযোগ ১/১:

[সংখ্যা প্রতিযোগটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ৩০শে জুনের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এবারের সংখ্যা প্রতিযোগটি তৈরী করেছেন মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ১০ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনোটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

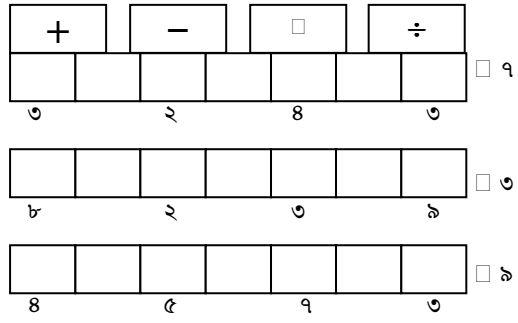

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা :** বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*

গত সংখ্যার (জুলাই-আগস্ট ২০১২) কুইজের উত্তর :

কুইজ-১ : ১. গ, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ, ৫. গ, ৬. খ, ৭. খ, ৮. গ, ৯. গ, ১০. ঘ।

শব্দজট : পাশাপাশি : ১. আফ্রিকা। ৩. বিপদ। ৫. কমল। ৬. মতন। ৭. আযান। ৯. সাভার। ১০. মলম। ১১. আরাফা। ১৩. সমাজ। ১৫. জল্লাদ।

উপর-নীচ : ২. ফ্রিডম। ৪. পাহাড়। ৭. আসাম। ৮. নরম। ১২. রামাল্লা। ১৪. মারাঠা।